পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ৫ম সংখ্যা

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা '৯৮-এর ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা করছেন।

ওপরে ঃ বাংলাদেশী জময ভাই তারেক যুবায়ের যুক্তরাজ্য জামাতের ১৯৯৮ সনের সালানা জলসায় নযম পাঠ করছেন। হুযূর (আইঃ) পার্শ্বে উপবিষ্ট।
নীচে ঃ হুযূর (আইঃ)-এর দু'পার্শ্বে তারেক যুবায়ের জময ভ্রাতৃদ্বয়।

খেলাফত
আহমদীয়া জামাতের মূলশক্তি

কুরআন শরীফের ও সহীহ্ হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহতাআলা আমাদেরকে খেলাফতের নিয়ামত দান করেছেন। খেলাফত মোমেনদের সম্মিলিত তাক্ওয়ার নির্যাস। জামাতের উন্নতির জন্য, জামাতের সদস্যদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য খলীফা দিনরাত দোয়া করে থাকেন। তাঁর দোয়াতে বিশেষ কুবলিয়াত প্রদর্শন করা হয়। এই দোয়াই আমাদের সাফল্যের মূল মন্ত্র।

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থ। তাঁর জন্য সমগ্র জামাত সদকা ও দোয়া করে যাচ্ছে। খলীফার অনুসারী হিসেবে, তাঁর অনুগ্রহ ও দোয়ার ফল ভোগকারী হিসেবে এখন প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, আমরা যেন আন্তরিকভাবে তাঁর দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্যের জন্য আল্লাহ্তাআলার কাছে দোয়া করি।

গত শুক্রবার হুযূর (আইঃ) কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে নিজে সংক্ষিপ্ত জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে হুযূর (আইঃ)-এর দর্শন লাভ করে। খুতবায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে হুযূর (আইঃ) নিজের জন্য দোয়ার আবেদনও করেন।
গত ১৩/৯/৯৯ তারিখে প্রাপ্ত ফ্যাক্সে হুযূর (আইঃ)-এর স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সকল ময়মুরব্বী ভাই, বোন ও ছোটদের কাছে যুগ-খলীফার জন্য নিয়মিত দোয়ার আবেদন রাখছি। আল্লাহ্তাআলা আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূরকে কর্মক্ষম দীর্ঘজীবন দান করুন। আমীন ॥

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা

৩১ ভাদ্র ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ৩ জমাঃ সানী ১৪২০ হিঃ কাঃ
৫ তাবূক ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

যিক্‌রে খায়ের

জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ মৃত্যু অনেক সময় জাতির একটি বিরাট ক্ষতি সাধন করে যায়। যদি জাতি সে ক্ষতি পূরণের জন্যে পরিকল্পনা মাফিক সর্বাত্মক চেষ্টা না চালায় তাহলে সে ক্ষতি সহজে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতের এমনই একটি ক্ষতি সাধিত হয়েছে মোহতরম মোকার্‌রম জনাব মকবুল আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে।

বিগত ৪/৯/৯৯ তারিখ রোজ শনিবার দিবাগত রাত্র ১২টার সময় জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব সি এইচ এম-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। উল্লেখ্য, তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এ সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৯ বছর। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুউচ্চ মকাম দান করেন। মরহুমের পরিবার-পরিজনের জন্যেও আমরা দোয়া করি। আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে অনায়াসে যেন এ শোক কাটিয়ে ওঠার সৌভাগ্য দান করেন এবং মরহুমের গুণাবলী যেন তাদের মধ্যে আত্মস্থ করার সৌভাগ্য দেন।

মরহুম মকবুল আহমদ খাঁন ছিলেন সিলেটের সুসন্তান। যৌবনে তিনি আহমদীয়ত কবুল করেন। মরহুম পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ আমলে গণসংযোগ ডাইরেক্টরের অধীন কাজ করেন এবং ডি, জি থাকা অবস্থায় সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী থাকাবস্থায়ও এবং পরেও তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের সেবা করেন। তিনি ঢাকা জামাতের আমীর, মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকার যয়ীম-এ আলা, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মজলিসে আমেলার সদস্য হিসেবে সেবা দান করেন। মরহুম বিভিন্ন কমিটির প্রধান / সদস্য হিসেবেও জামাতের অনেক খেদমত করে গেছেন। জনাব মকবুল আহমদ খান সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিখ্যাত পুস্তক বারাকাতুদ্ দোয়া-এর বঙ্গানুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম ৩১-১২-৮৮ সন থেকে আমৃত্যু পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শক্তিশালী ড্রাফট রচনা করতে পারতেন।

তিনি সাদা-সিদা অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। একজন সৎ অফিসার বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টে সচ্চরিত্রবান নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁর বাসায় যেকোন স্তরের লোক যাক না কেন তিনি মেহমানদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মীরপুর থেকে বাসে চড়ে এসে জামাতী কাজে অংশ নিতেন। একবার বাসে উঠে আসার সময়ে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন নির্ভীক নিরলস। পরের দুঃখে তিনি খুব কাতর হতেন। তিনি অনেক গরীব ও মেধাবী লোকদের আয় উপার্জনের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। আমরা মরহুমের আত্মার সর্বাঙ্গীণ শান্তি কামনা করি।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ তওবা (ক্ষমা চাওয়া)	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ – জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৪ ও ১৫
❑ জুমুআর খুতবা ঃ শহীদদের স্মরণে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ – মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫–১০
❑ জুমুআর খুতবা ঃ সালানা জলসা উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১১–১৪
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৬-১৭
❑ ইংরেজদের এজেন্ট ! সংকলন - বুরহান আহমদ যাফর দুররানী	ঃ সংগ্রহ ও অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮-২০
❑ ছোটদের পাতা ঃ মুকাদ্দস বিরসাহ্ (পবিত্র উত্তরাধিকার) মূল ঃ মিসেস বুশরা দাউদ	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান.	২১–২২
❑ হিন্দু ধর্ম পরিচিতি ও ইসলামী দৃষ্টিতে হিন্দু ধর্ম	ঃ জনাব শেখ জোনাব আলী	২২-২৩
❑ প্রসঙ্গ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশবাস	ঃ জনাব মোঃ ফজল-ই-ইলাহী	২৪-২৫
❑ ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসায় গোটা রাবওয়া জলসা গাহে পরিণত	ঃ সংগ্রহ ও অনুবাদ - আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	২৬
❑ তাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে ?	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৭
❑ সংবাদ	ঃ	২৮

প্রচ্ছদ ঃ ওপরে ঃ ১৯৯৮ সনে আন্তর্জাতিক মজলিসে শূরায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। নীচে ঃ হুযূর (আইঃ) আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

আখবারে আহমদীয়া

হুযূর (আইঃ)-এর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সর্বশেষ খবরে জানানো হয়েছে যে, তিনি সুস্থ আছেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে আরও বিশ্রাম নিতে হবে।

হুযূর (আইঃ)-এর উদ্দেশ্যে দোয়া ও সদ্‌কা অব্যাহত রাখার জন্যে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব জানিয়েছেন।

– আহমদী বার্তা

বিশেষ শোক সংবাদ

মোহতরম জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, প্রাক্তন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ ও সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী গত ৪-৯-৯৯ তারিখ দিবাগত রাত্র ১২টার সময় বার্ধক্যজনিত কারণে সি এম এইচ এ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ৭৯ বছর। বেলা দু'টায় দারুত তবলীগে মরহুমের উদ্দেশ্যে জানাযার নামায পড়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা এবং বহু নাতি-নাতনী রেখে গেছেন।

মরহুমের মৃত্যুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলা ঐদিন বেলা ২টায় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে ঃ

"মোহতরম জনাব মকবুল আহমদ খান, প্রাক্তন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ ও সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদীর মৃত্যুতে মজলিসে আমেলা ও গোটা জামাতের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ হয়। সভায় মরহুমের বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ডকে স্মরণ করে যিকরে খায়ের করা হয়। মরহুমের মৃত্যুতে জামাত তার এক কৃতী সন্তানকে হারালো। মরহুম সরকারী উচ্চ পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা জামাতের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। একজন সুবক্তা ও সুলেখক হিসেবে তিনি বিরল যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ঢাকা জামাতের আমীর ছিলেন দীর্ঘদিন। পরে মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঢাকা-এর যয়ীম-এ আলা এবং বিভিন্ন কমিটিতে বিভিন্ন সময় কমিটি প্রধান / সদস্য হিসেবে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। মরহুম ছিলেন একজন নীরব নিরলস কর্মী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী।

সভায় মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এ শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং দোয়ায়ে মাগফেরাত কামনা করা হয়। আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর রূহকে জান্নাতুল ফিরদৌসের উচ্চ মাকাম দান করেন। মরহুমের সুন্দর গুণাবলী যেন হারিয়ে না যায় সেজন্যে আমরা দোয়া করি। তার পরিবার-পরিজনের মাঝে তাঁর গুণাবলী যেন চিরস্থায়ী হয়।

আল্লাহ্‌তাআলা মরহুমের পরিবারের সকলকে তাঁর অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট দুঃখ-বেদনায় যেন সাবরে জামীল দান করেন।

এ শোক প্রস্তাবের কপি মরহুমের বিধবা পত্নী ও পরিবারের সকলের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।"

– আহমদী বার্তা

সূরা আল্ আন'আম - ৬

৩৭। যারা শুনে, একমাত্র তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতদের ব্যাপার ৮৪৪-ক এই যে, আল্লাহ্ তাদিগকে উত্থিত করবেন৮৪৫; অতঃপর তাদিগকে তাঁরই নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

৩৮। এবং তারা বলে; 'তার উপর তার প্রভুর নিকট হতে কোন নিদর্শন কেন নাযেল করা হয় নি ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ নিশ্চয় নিদর্শন নাযেল করতে ক্ষমতাবান, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।'

৩৯। এবং ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণশীল জন্তু আছে ও এমন যত পাখী আছে যারা স্ব স্ব ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়ে, তারাও তো তোমাদের মতই জাতি বিশেষ।৮৪৬ আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেই নি। অতঃপর তাদিগকে তাদের প্রভুর নিকটে সমবেত করা হবে।

৪০। আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে তারা বধির ও মুক, অন্ধকাররাশির মধ্যে নিপতিত। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, যাকে চান তাকে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৪১। তুমি বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমরা কি চিন্তা করে বলবে যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত ৮৪৭ এসে পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে ?

৪২। বরং তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে উহা নিশ্চয় দূর করে দেবেন এবং তোমরা যা (তাঁর সঙ্গে) শরীক করছো তা তোমরা বিস্মৃত হবে।৮৪৮ ৪র্থ রুকূ

৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর নিকটে (রসূল) প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর আমরা তাদিগকে আর্থিক সংকট এবং শারীরিক কষ্টে৮৪৯ আক্রান্ত করেছিলাম যেন তারা বিনয়াবনত হয়।

৪৪। অতএব, যখন তাদের ওপরে আমাদের শাস্তি আসল তখন তারা কেন৮৫০ বিনীত হ'ল না ? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যে কাজ-কর্ম করতো শয়তান উহা তাদের জন্যে আরও সুশোভন করে দেখালো।

৪৫। অতঃপর তাদিগকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল যখন তারা উহা বিস্মৃত হ'ল, তখন আমরা তাদের উপরে সকল বিষয়ের দুয়ার খুলে দিলাম–এমন কি তাদিগকে যা প্রদান করা হয়েছিল উহাতে যখন তারা আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল, তখন আমরা অকস্মাৎ তাদিগকে ধৃত করলাম; তখন দেখ! তারা একেবারে নিরাশ হয়ে গেল।

৮৪৪-ক। কুরআনে 'মাউতা' শব্দ সত্য হতে বঞ্চিতদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে।

৮৪৫। এই আয়াতে দু'প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (ক) যারা অন্তরে সৎ, মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং শুনা মাত্রই সত্যকে গ্রহণ করে, এবং (খ) যারা প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃতবৎ কিন্তু আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের যোগ্যতাসম্পন্ন। আল্লাহ্তাআলা তাদিগকে নিদর্শন দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলবেন এবং তৎপর তারাও শ্রবণ করবে ও ইসলাম গ্রহণ করবে।

৮৪৬। এই আয়াত নির্দেশ করছে যে, এমনকি পাখীরা এবং পিপীলিকার মত প্রাণীরাও আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারে যে, ঝড় আসন্ন এবং কুকুরের মত পশুরাও তাদের মনিবের আদেশ বুঝতে পারে। কিন্তু নির্বোধ অবিশ্বাসীরা দেয়ালের লিখন দেখতে পারে না এবং তারা বুঝতে পারে না যে, নবী আকরম (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহ্তাআলার অসন্তুষ্টি ডেকে এনেছে। তাদিগকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আর অবশ্যই তাদিগকে জবাব দিতে হবে। এই আয়াত আরও দু'প্রকার মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করছে ঃ (ক) যারা পশুর ন্যায় কেবল দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট এবং জীবন-ভর তারা দৈহিক কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে মগ্ন, (খ) পাখীর ন্যায় যারা আধ্যাত্মিক মার্গে উড়তে থাকে। উচ্চ মাকামের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণকে কুরআনে (৩ঃ৫০) পাখীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৮৪৭। "সেই মুহূর্ত" কথাটি ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়, অথবা (ইসলামবিরোধী শক্তির) পতনের সময়ের প্রতি ইশারা করছে।

৮৪৮। "তোমরা যা (তাঁর সঙ্গে) শরীক করছো তা তোমরা বিস্মৃত হবে" এই কথা মক্কা-বিজয়ের দিনে আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। সেদিন মক্কাবাসীগণ তাদের দেবতা বা মূর্তিগুলোর ওপরে সকল বিশ্বাস হারিয়েছিল–যেমন আবূ সুফিয়ান, তার স্ত্রী হেন্দা এবং অন্যান্যরা অকপটে নবী করীম (সঃ)-এর উপস্থিতিতে তা স্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত আরব দেশ হতে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

৮৪৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণভাবে ঐশী-শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই আয়াতে শাস্তির বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৫০। "লাওলা" (অর্থ কেননা) শব্দদ্বয় শুধু প্রশ্নবোধক রূপেই এখানে ব্যবহার করা হয় নি, বরং সহানুভূতি প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্তাআলার নিকট তাদিগের অবশ্যই বিনয়াবনত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তারা তা করে নি।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

হাদীস শরীফ

তওবা (ক্ষমা চাওয়া)

কুরআন ঃ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

অর্থ ঃ এবং হে আমার জাতি ! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; অতঃপর তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর, . . . (সূরা হূদ ঃ ৫৩)।

হাদীস ঃ আগার্‌রিবনে ইয়াসারেল মুযানি রাযিআল্লাহু আন্হু ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইয়া আয়্যুহান্নাসু তূবূ ইলাল্লাহে ওয়াস্‌তাগফিরহু ফাইন্নি আতুবু ফিল ইয়াওমে মেআতা মার্‌রাতিন (মুসলিম)

অর্থাৎ আগাররিবনে ইয়াসারেল মুযান্নি (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুনাহ্‌র জন্যে মাফ চাও, আমি একদিনে একশতবার তওবা করি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। অনেক সময়ে এ ভুলের অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলেরই সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবন ভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু ভুল করে সেহেতু সে দুর্বল। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়। খুব কম লোক এমন রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করাতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা তওবা করতে বলেছেন। ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি দান করবো। অর্থাৎ এক কথায় ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু গুনাহ্‌গারের জন্যেই যে তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে, বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ যা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

আঁ হযরত (সঃ) তাঁর উম্মতকে নসীহত করেছেন যে, হে আমার উম্মত ! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। আঁ হযরত (সঃ)-এর মত নিষ্পাপ আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত। আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে যে শর্তে বয়াত হয়েছি ওখানে এ শর্তটিও রয়েছে যে, দৈনিক ইস্তেগফার করবো।

ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে। মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন আমরা হযরত নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**, সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

নামায
হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সহিত আদায় করে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩৮)।

"নিজের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এইরূপ ভীতি সহকারে ও নিবিষ্ট চিত্তে পড়িবে যেন তোমরা খোদাতাআলাকে সাক্ষাতভাবে দেখিতেছ" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ৩০ ও ৩১)।

"নামায কী ? ইহা হইল দোয়া, যাহা 'তসবীহ্' (মহিমা কীর্তন) 'তাহ্‌মীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্র ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দুরূদ' সহ (অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জন্য আশিস কামনা করতঃ) সবিনয়ে প্রার্থনা। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং 'ইস্তেগফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে কোন সার-বস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদাতাআলার কালাম কুরআনে এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়। . . . . নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কী নিয়তি আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের উদয়ের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মাওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১১৭, ১১৮ ও ১২০)।

"নামায কী ? নামায প্রকৃতপক্ষে 'রব্বুল ইজ্জত' এর নিকট দোয়া, যাহা ব্যতীত মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না, না ভাল থাকার ও খুশীর উপকরণ লাভ করা যাইতে পারে। যখন

অবশিষ্টাংশ ১৫ পাতায় দ্রষ্টব্য

জুমুআর খুতবা

শহীদদের স্মরণে

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ৯ জুলাই, ১৯৯৯ মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫৪ ও ১৫৫ তম আয়াত অর্থসহ তেলাওয়াত করেন ঃ

অর্থ ঃ "*হে যারা ঈমান এনেছ ! (আল্লাহ্‌র নিকট) তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো; নিশ্চয় আল্লাহ্ এই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না ; তারা তো জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।*"

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ চতুর্থ খিলাফত কালে শাহাদত বরণকারীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং আজ এর দ্বিতীয় কিস্তি। সর্বাগ্রে সিন্ধু দেশের **পানু আকেল নিবাসী মাহ্মুদ আহ্মদ আঠওয়ালের** কথা বলছি। তিনি ২৯শে জুলাই, ১৯৮৫ ইং শাহাদত বরণ করেন।

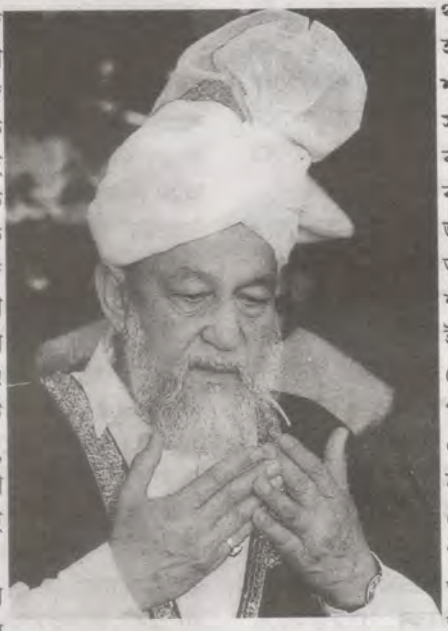

শহীদের স্ত্রী রশীদা বেগম লিখেছেন যে, মাহ্মুদ সাহেব শাহাদত লাভের খুবই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। '৭৪ সনে আহ্মদীদের বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছিল, কিন্তু এর মোকাবেলায় প্রতিবার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি দৃঢ়তার পরিচয় দেন। এই বিরোধিতা কম হবার পরিবর্তে বরং বৃদ্ধিই পেতে থাকে এবং তাঁর মামাত ভাই মকবুল আহ্মদকে '৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পানু আকেলে শহীদ করা হয়েছিল। যখন তিনি তাঁর ভাইয়ের লাশ বেহেশ্‌তী মাকবেরায় কবরে নামাচ্ছিলেন তখন তাকে উদ্দেশ্যে করে বলছিলেন, "হে মকবুল ! এই পদমর্যাদা সৌভাগ্যশালীদেরই নসীবে ঘটে থাকে।' তারপর নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে মাহ্মুদ ! হায়, তোমারও যদি এই পদমর্যাদা পাওয়ার সৌভাগ্য হতো এবং তুমিও যদি এখানেই আসতে !"

রাবওয়া থেকে ফিরে আসলে পানু আকেলের পুলিশের কর্ম-কর্তা বল্‌লেন, 'আপনি আপনার জমি-জিরাত বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যান। আগেও আপনার একজন আত্মীয়কে শহীদ করা হয়েছে। মৌলবীদের কারণে আমরা নিরুপায়; কিছুই আমাদের করার থাকে না।" তিনি উত্তর দিলেন, "আহ্মদীয়তের বিরোধিতা তো সবখানেই। সর্বত্র শত্রু রয়েছে। যদি আমাকে শাহাদত বরণ করতে হয় তাহলে এখানেই করি না কেন ?" তার দুই ছেলে স্কুলে গেলে মৌলবীদের নির্দেশ মতে কয়েকজন ছেলে-ছোকরা তাদেরকে চপেটাঘাত এবং গালি-গালাজ করতো। স্কুলে শিক্ষকরাও ধর্মীয় মত পার্থক্যের দরুন কঠোর আচরণ করতো। সন্ত্রাসী দল প্রায়শঃ তাদের বাড়ীর ওপরও গুলি বর্ষণ করতো। শত্রুরা রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে তাঁর ক্ষেতের পানি বন্ধ করে দিত। কখনও ফসলে আগুন ধরিয়ে দিত অথবা পাকা ফসল কেটে নিয়ে যেত, যাতে তাঁদের আর্থিক সংকট ঘটে এবং কোনও উপায়ে এরা আহমদীয়ত ত্যাগ করে। তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন, এক রাত্রে দরজায় করাঘাত হলো। তাঁর ভাতিজা সায়ীদ বের হলো। দরজার কাছেই দুই ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিলো। সায়ীদ বের হওয়া মাত্র তারা তাকে আক্রমণ করলো। একজন তার চোখ, মুখ ও নাক কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। অন্যজন তাকে মারতে শুরু করল এবং টেনে-হিঁচড়ে পনর গজ দূরে নিয়ে গেল। সায়ীদ পরে জানায় যে, সে-অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাকে আঘাতকারী লোকটা যখন ছোড়া বের করলো এবং পুরোপুরি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়ার দরুন তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে শেষ বারের মত প্রাণ-পণ চেষ্টা করলো এবং তার মুখ বন্ধনমুক্ত করতে সে সফল হল এবং চিৎকার করে চাচাকে ডাক দিলে মাহ্মুদ আহ্মদ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছুলেন। একজন তো দৌড়ে পালালো। আরেকজন ধরা পড়লো। ধৃত অপরাধী পুলিশকে জানালো যে, সে ঘোটকির এক মাদ্রাসার ছাত্র। মৌলভী সাহেবরা তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন ঐ আহমদী যুবকটিকে হত্যা করতে। কিন্তু সে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। সায়ীদ আজকাল রাবওয়ায় বসবাস করেন। দোকানদারী করেন। মুল্লারা রীতিমত মানুষকে প্ররোচিত করতে থাকে এই বলে যে, মাহ্মুদ আহ্মদ কাদিয়ানীকে হত্যা করা ওয়াজেব এবং সওয়াবের কাজ।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ২৯ শে জুলাই, ১৯৮৫ ইং সন্ধ্যা বেলায় যখন তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেলেন তখন তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেও তাঁর সঙ্গে ছিল। ফেরার পথে তিন জন মানুষ হঠাৎ একটি গলি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। তখন ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তিনি তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ছয় মেয়ে এবং চার ছেলে রেখে যান। তাদের মধ্যে পাঁচ মেয়ের খোদাতাআলার ফযলে বিয়ে হয়েছে এবং তারা সুখে আছে। অবশিষ্টদের বিয়ে এখনও হয় নি। কন্যা উয্‌রা পারভীনের বিয়ে হয়েছে শেখুপুরা জিলার অন্তর্গত ফারুকাবাদে এবং খালেদা পারভীনের রাবওয়ার নিকটবর্তী আহমদবাদ সাংরায়। নাগীনা পারভীন বিবাহিতা, অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন। ফারুক আহমদ আমেরিকায় আছেন এবং অবিবাহিত। সাজেদা পারভীন জার্মানীতে আছেন, বিবাহিতা। তাহেরা পারভীন থাকেন মায়ের সাথে রহমান কলোনী, রাবওয়ায়। দুই ছেলে তাহের আহমদ ও ওসমান আহ্মদ মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে এবং এক ছেলে লুকমান আহ্মদ সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। তারা সবাই মায়ের সঙ্গে বাস করছে। অতএব, আল্লাহ্‌র ফযলে শহীদের সকল সন্তান দীন ও দুনিয়া উভয়ে দিক দিয়ে উন্নতির পথে রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা সার্বিকভাবে সদা তাদের হিফাযত করুন।

মির্যা মুনাওয়ার বেগ শহীদ লাহোরস্থ চুঙ্গী আমরসিন্ধুর অধিবাসী। ১৮ই এপ্রিল, ৮৬ ইং তারিখে শাহাদত বরণ করেন। আহ্মদীয়তের এক বৈরী আব্দুশ্ শকুর মানশা তাঁকে ১৭ এপ্রিল গুলি বিদ্ধ করে এবং তিনি হাসপাতালে পরের দিন মারা যান (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদের পুত্র মির্যা আক্‌দস বেগ সাহেব লিখেছেন যে, তাঁর পিতা মির্যা মুনাওয়ার বেগ সাহেবের কারও সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাঁর তবলীগের শখ ছিল, সেজন্যে জনৈক মৌলবী হামীদ এবং চেলারা এ বিষয়টি পসন্দ করতো না। শাহাদতের পনর দিন আগে শহীদের এক বন্ধু- যে কিনা মৌলবী হামীদের অনুচর ছিল তাঁর কাছে আসল এবং জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়ীতে কি অস্ত্র ইত্যাদি কিছু আছে ?' আমার পিতা উত্তর দিলেন, 'কারও সাথে আমার কি কোনও

শত্রুতা আছে ?' সে বল্‌লো, 'সারা এলাকা জুড়েই তোমার শত্রু রয়েছে, তুমি অস্ত্র-সস্ত্র জোগাড় কর।' আমার পিতা বল্‌লেন, 'ভাল কথা, করে নেব।' যথাসম্ভব সে লোকটিও খোঁজ নিতে এসেছিল এই বাড়ীতে অস্ত্র আছে, কিনা। একদিন তাঁর বাড়ীর বাইরে হট্টোগোল শোনা গেল। বাড়ীর লোক তা দেখার উদ্দেশ্যে বাইরে বেরুলেন। তখন জানা গেল, মৌলবী হামীদের একজন বিশেষ প্রিয় সাগরেদ মানশা মির্যা মুনাওয়ার বেগ সাহেবকে গুলিবিদ্ধ করেছে। তিনি তখন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পরের দিনই তিনি ইন্তেকাল করলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

তিনি রেখে যান তাঁর স্ত্রী সাজীদা বেগম সাহেবা ব্যতীত চার কন্যা এবং চার পুত্র মির্যা আক্‌দস বেগ, মির্যা মুযাফ্‌ফর বেগ, মির্যা ওয়াসীম বেগ এবং মির্যা তাহের বেগ। তারা তাঁদের মায়ের সাথে লাহোরে থাকেন। মির্যা আক্‌দস বিবাহিত, আর তিন ভাই এখনও বিয়ে করেন নি। মেয়েদের মাঝে নুসরৎ মুবারাকা বেগম সাহেবা মুবারক আহ্‌মদ খান সাহেবের স্ত্রী, জার্মানীতে বসবাস করেন। বুশরা জাহাঙ্গীর সাহেবা মির্যা জাহাঙ্গীর সাহেবের স্ত্রী, ফয়সলাবাদে আছেন। তৃতীয়া কন্যা রুখসানা সাহেবা নাসীম বেগ সাহেবের স্ত্রী রাওয়ালপিন্ডিতে থাকেন। চতুর্থ মেয়ে নসীবের স্বামী হচ্ছেন মির্যা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব- তিনি কৃষি খামার করেন। অতএব, শহীদের সন্তানরা সবাই আল্লাহ্‌র ফযলে সুখে-শান্তিতে আছেন।

সৈয়্যদ কামরুল হক্ সাহেব, শুক্কুর (সিন্ধু প্রদেশ) নিবাসী এবং **রাও সুলায়মান খালেদ** সাহেব, করাচী নিবাসী; উভয় শুক্কুরে ১১ মে, ১৯৮৬ তারিখে শাহাদত বরণ করেন। করাচীর এই ভ্রাতাকে সৈয়দ কামরুল হকের হিফাযতের উদ্দেশ্যে শুক্কুরে পাঠানো হয়েছিল এবং ঐ সময় সেখানে তাঁর সঙ্গেই শাহাদত বরণ করেছিলেন। নিজে তিনি আহ্‌মদী হয়েছিলেন। তাঁর পিতা অ-আহ্‌মদী ছিলেন এবং শেষাবধি অ-আহ্‌মদীই থাকেন। কামরুল হক্ সাহেব ছিলেন মুকাররম সৈয়্যদ আব্দুল হাদী মুঙ্গেরীর পুত্র। মুঙ্গের জেলার চন্দারে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কাদিয়ানে যান এবং মিড্‌ল পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন। দেশ-বিভাগের পর মুলতান থেকে তিনি মেট্রিক করেন। তারপর ছয় বছর ব্যাপী সিলসিলার কেন্দ্র রাবওয়ায় প্রাইভেট সেক্রেটারী, ওসীয়্যত এবং খাযানা বিভিন্ন অফিসে খেদমত সম্পাদন করেন। ১৯৫৬ সালে শুক্কুর চলে যান এবং সেখানেই তিনি এম.এ. এবং বি.টি. পরীক্ষা পাশ করে কামরান হাই স্কুলে ইংলিশ টিচার হিসেবে লেগে যান। শাহাদতের সময় ঐ প্রতিষ্ঠানেই চাকুরীরত ছিলেন। তিনি দারুল ইফ্‌তার কারকুন মরহুম সৈয়্যদ শামসুল হক সাহেব এবং আমীরে- জেলা মরহুম সৈয়্যদ নাজমুল হক সাহেবের ভাই ছিলেন। যৌবনকালেই তিনি ওসীয়্যত-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। নামায-রোযায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কায়েম, স্বল্পভাষী ও গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। শুক্কুরে তিনি এ্যক্টিং আমীর এবং যয়ীম আনসারুল্লাহ্ হিসেবে সিলসিলার খিদমত পালনের তৌফীক লাভ করেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১লা রমযান, মোতাবেক ১১ মে '৮৬-এর সকালে তিনি তাঁর বাড়ী থেকে স্কুল যাওয়ার জন্যে পায়ে হেঁটে রওনা হন। করাচীর নবদীক্ষিত খাদেম রাও সুলায়মান খালেদ সাহেবও সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে মিনারা রোডের চকের কাছে অপরিচিত পাঁচজন লোক হঠাৎ ছোরা-কুড়াল দ্বারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। মুকাররম খালেদ সুলায়মান সাহেব কিছুক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। কিন্তু আক্রমণকারীরা পিস্তলের গুলি বর্ষণ করে এবং ছোরা-কুড়ালের ক্রমাগত আঘাত হেনে দু'জনকেই শহীদ করে ফেলে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর। পুলিশের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট করা হয়। কোনও হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা হয় নি। ১২ মে '৮৬-এর সন্ধ্যায় শহীদদ্বয়ের জানাযা রাবওয়া পৌছান হয়, সেখানে নামায-জানাযা আদায়ের পর তাঁদেরকে শহীদদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। শহীদ সৈয়্যদ কামরুল হক্ তাঁর বিধবা স্ত্রী ব্যতীত এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে যান। পুত্র আনওয়ারুল হক্ অবিবাহিত এবং অষ্ট্রেলিয়ায় থাকেন। জ্যৈষ্ঠা কন্যা আতিয়া সুলতানা মোকাররম মসরুর মোস্তফা সাহেবের স্ত্রী, লাহোরে বসবাস করেন। দ্বিতীয়া কন্যা তানভীর কামর মোকাররম মুদাস্‌সের আহ্‌মদ মালেকের স্ত্রী এবং ক্যালগ্যারিতে বসবাস করেন। তৃতীয়া কন্যা শর্মীন কামর অবিবাহিত এবং মায়ের সঙ্গে করাচীতে আছেন।

শহীদ রাও সুলায়মান খালেদ সাহেব গোজরা টোবাটেকসিং-এর অধিবাসী এবং পরিবারের মধ্যে একাই আহ্‌মদী ছিলেন। শাহাদত বরণের দু'তিন বছর আগে তিনি বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইখ্‌লাস ও নিষ্ঠার দরুন 'সাবেকুনাল আওওয়ালূন'-এর মাঝে গণ্য হতে আরম্ভ করেন। করাচীতে চাকুরী করতেন। শুক্কুরের অবস্থার প্রেক্ষিতে সে জামাতের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

শাহেদা রুখসানা তারেক সাহেবাকে মর্দানে ৯ জুন, ১৯৮৬ ইং তারিখে ঈদের দিন শহীদ করা হয়। তাঁর পিতা বর্ণনা করেন, "এক অদ্ভুত বিষয় আমি রুখসানার মাঝে লক্ষ্য করি। বিষয়টি বিয়ের ক'দিন পর যা তার 'জেহেয' বন্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিয়েতে পাওয়া তার সমস্ত জিনিস-পত্র গরীব মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করায় সে বল্‌ল, 'আমি মাকে বলেছিলাম, আমাকে শুধু একটি খাট দিয়ে দিন। জীবন তো লয়শীল। এর ওপর কী ভরসা ? গরীবদের যেটুকুই খিদমত করতে পারি তাতেই আমি নিজেকে আনন্দিত বোধ করি।" তার স্বামী তারেক সাহেব বলেন, দরিদ্রদের সেবা করে আনন্দের আভা তাঁর চেহারায় এতো ঝলমল করতো, যেন সূর্য বেরিয়ে এসেছে। ঈদের দিন তিনি ঈদের নামাযে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারেকের বড় ভাই বিরোধিতা করলো এবং কঠোরভাবে নিষেধ করে দিল। কিন্তু তিনি বাধা মানলেন না এবং পুরান কাপড়েই ঈদের নামায আদায়ের জন্যে চলে গেলেন। অথচ বিয়ের পর এটি তাঁর প্রথম ঈদ ছিল। ঈদের নামাযের মধ্যে তিনি অনেক কাঁদলেন। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দভরে বাড়ী ফিরলেন। সবার জন্যে নাস্তা তৈরী করলেন। তাঁর স্বামী বর্ণনা করেন, "আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম তিনি এতো সন্তুষ্ট কেন। খুশী-খুশী সবার সাথে মিলিত হলেন। আমরা কী ভাবেই বা জানতাম যে, এগুলো ছিল তার জীবনের শেষ মুহূর্ত ! মনে হয় শাহাদতের সংবাদ তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। এ ছিল তার অন্তিম অবস্থা।"

ইতোমধ্যে তারেকের বড় ভাই আসলো। আর আসা মাত্র সে বৃষ্টিধারার ন্যায় গুলি বর্ষণ করলো। তারেকের বর্ণনা যে, তিনি প্রায়শঃ বলতেন, 'আমি যখন আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য বরণ করবো তোমরা আমাকে পাহাড়ের পাদপাশে দাফন করো।' সুতরাং তা রাবওয়ারই পাহাড় ছিল, যেখানে অবশেষে তিনি সমাহিত হলেন। এই শাহাদত বরণকারিণী ছিলেন সারগোধা নিবাসী মুকাররম মির্যা খান মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা। তাঁর স্বামী(তারেক) তার শ্বশুর মির্যা খান মুহাম্মদ সাহেবের কাছেই থাকেন।

হায়দরাবাদ-সিন্ধের আমীর মুকাররম **বাবু আব্দুল গফুর সাহেব** ৯ই জুলাই, ১৯৮৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে তাঁর পিতা সপরিবারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর মরহুম বাবু আবদুল গফুর হিজরত করেন এবং সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদে এসে বসবাস স্থাপন

করেন। পেশার দিক থেকে তিনি ছিলেন ফটো গ্রাফার। কুরআন করীমের প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা রাখতেন। অত্যন্ত মিশুক এবং জামাতের সেবায় সর্বদা তৎপর থাকতেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী জামাতের ইমারতের দায়িত্বভার তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকে। হায়দরাবাদে তিনি ছিলেন জামাতের প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ। একজন নির্ভিক দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন তিনি এবং আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ওসীয়্যতাকারীও ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ৯ই জুলাই '৮৬ ইং দ্বিপ্রহর ১টা বাজে তখন তিনি তাঁর দোকানের শো রুমে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় এক পাষন্ড মুল্লা তাঁর দোকানে প্রবেশ করলো এবং ক্রমাগত ছুরিকাঘাত করে সে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। তাঁর হাতের আলামত প্রমাণ বহন করছিল যে, তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে থাকেন। তখন দোকানে তাঁর মাত্র একজন কর্মচারী উপস্থিত ছিল। কিন্তু ডার্ক রুমে সে কাজ করছিল। যখন অবসর হয়ে সে বাইরে এসে চীৎকার করতে আরম্ভ করলো, তখন মানুষ জড়ো হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আল্লাহ্‌র এই প্রিয় বান্দা তাঁর সান্নিধ্যে চলে গেলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। রাবওয়ায় তিনি সমাহিত হলেন। উত্তরসূরীর হচ্ছেন ঃ জ্যেষ্ঠপুত্র মুকাররম যুলফিকার আলী কোরেশী বিগত চল্লিশ বছর থেকে এখানে(লন্ডনে) আছেন। তারপর তাঁর সন্তানদেরও বিয়ে-শাদী হয়েছে। মুকাররম মুবারেকা বেগম মোহাম্মদ আফযাল সাহেবের স্ত্রী, করাচীতে আছেন। মোকাররমা সিদ্দীকা বেগম হেকীম আব্দুল বাসেত সিদ্দিকী সাহেবের স্ত্রী, হায়দরাবাদে আছেন। মোকার্‌রমা সাদেকা বেগম মির্যা আলতাফ আহ্‌মদ সাহেবের স্ত্রী, ওয়াহ্ ক্যান্টে থাকেন। মুকাররম বুশরা সাহেবা জনাব ওয়াহীদ আহ্‌মদ সাহেবের স্ত্রী, জার্মানীতে আছেন এবং তাঁর হালকার লাজনার প্রেসিডেন্ট তিনি। মুকার্‌রমা সাবেরা সাহেবা মরহুম যহূর হুসেন সাহেবের স্ত্রী। তিনি তাঁর সন্তানদের নিয়ে জার্মনীতে বসবাস করেন। শহীদ বাবু আব্দুল গফুর সাহেবের সকল সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র ফযলে দীন ও দুনিয়ার উভয় প্রকার নেয়ামতে ভূষিত।

শহীদ গোলাম যহীর আহ্‌মদ জেলা ঝিঁলামের অন্তর্গত সোহাওয়ার অধিবাসী ছিলেন। মুকার্‌রম শেখ বশীর আহ্‌মদ সাহেবের পুত্র। ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ ইং তারিখের রাতে তিনি বিজলী মেরামতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আহ্‌মদীয়তের বিরোধিতার দরুন অজ্ঞাত পরিচয় কিছু লোক গুলি করে তাঁকে শহীদ করে দেয় (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ মরহুম তাঁর বিধবা স্ত্রী ব্যতীত তিন মেয়ে এবং এক ছেলে স্মৃতিস্বরূপ রেখে যান। ছেলেটি জন্ম লাভ করে মরহুমের শাহাদতের ছ'মাস পরে। তারা সবাই এখনও লেখাপড়া করছে। নাযিয়া যহীর, রাশেদা যহীর, বুশরা ও আহ্‌সান যহীর তাদের মায়ের কাছে থাকে। শহীদের বিধবা স্ত্রী-র পরবর্তীতে শহীদের বড়ো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়।

শহীদ ডাঃ মুনাওয়ার আহ্‌মদ সাতরাঞ্জ নিবাসী ১৪ মে, ১৯৮৯ ইং শাহাদত বরণ করেন। তাঁর পিতা চৌধুরী বশীর আহ্‌মদ সাহেব গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত আঠওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। ডাঃ সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৫৭ সালে টোবাটেগসিং -এর চক নং ১৮ গ্রামে। তাঁর পরিবারে আহ্‌মদীয়তের সূচনা হয় তাঁর পরদাদা 'নওয়াব, পিতা জমিদার'-এর মাধ্যমে। শহীদ ডাঃ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নওয়াবশাহ্ জেলার অন্তর্গত সাতরঞ্জে, যেখানে তাঁর পিতা জীবিকাপোর্জন লক্ষ্যে বাস করতেন। মেট্রিক পাশ করার পর তিনি 'ফাযেল আল-তিব্ ওয়াল জারাহ্, ডিগ্রী লাভ করার পর সাত্‌রাঞ্জে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে সাতরঞ্জ জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট চৌধুরী ফার্যান্দ আলী সাহেবের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ডাঃ সাহেবের শাহাদতের পূর্বে তাঁর স্ত্রী স্বপ্নযোগে দেখেন যে, তাঁর সোনার চুড়িগুলোর একটি ভেঙ্গে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে আর সেই সঙ্গে রয়েছে অনেক মানুষের ভীড় এবং মহিলারা এক এক করে তাঁকে গলায় জড়িয়ে কাঁদছেন কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি যে, কেন তারা কাঁদছেন। ভোরে উঠে তিনি অস্থির বোধ করেন এবং সদকাও দেন কিন্তু অনুভব করেন যেন দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ডাঃ সাহেবকে যখন স্বপ্ন শোনালেন, তিনি বল্‌লেন, 'আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখ। যে রাতটির কবরে আসা অবধারিত, তা এর বাইরে (আগেই) আসতে পারে না।' মনে হয় যে, তিনি ঐ স্বপ্নের সঠিক তা'বির বুঝতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন তিনি। বলতেন, 'শাহাদতের সৌভাগ্য কোন কোন ব্যক্তিই লাভ করে থাকে, সবার ভাগ্যে তা জুটে না। খোশ নসীবরাই এই পদমর্যাদা পেয়ে থাকেন। হায় ! সে নসীব যদি আমার হতো !" সাতরাঞ্জের অবস্থার অবনতি ঘটলে তিনি স্ত্রীকে বল্‌লেন, 'রাবওয়া চলে যাও।' স্ত্রী বল্‌লেন, 'আপনাকে একা ছেড়ে আমি যাব না'। শাহাদতের (ঘটনার) দিন ক্লিনিকে দু'ব্যক্তি আসলো এবং গুলি বর্ষণ করে তাঁকে সেখানেই শহীদ করে গেল (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। কম্পাউন্ডার ক্রন্দনরত অবস্থায় এসে জানাল, 'ডাঃ সাহেবকে কে বা কারা জানি গুলি করেছে।' অনেক লোকের ভীড় জমে গেল। শোকের পর্বত যেন ভেঙ্গে পড়লো বিধবা স্ত্রী, সন্তান ও স্বজনের ওপর । শিশু সন্তানরা বল্‌ছিল, 'আব্বুকে কে মারলো? কেন মারলো ?' তাদের আরেকজন বল্‌লো, 'কেউ গুলি মেরে দিয়েছে।' আরেকটি বল্‌লো, 'আরও তো লোক ছিল, শুধু আব্বুকেই কেন মারলো ?' তারা শিশু বাচ্চা ছিল, এতো ছোট ছিল যে, এ সব বিষয় বুঝতে পারে না। শহীদের স্ত্রী মোকার্‌রমা কাওসার সাহেবা তাঁর চারটি শিশু সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এখন রাবওয়াস্থ বুয়ুতুল-হাম্‌দে বসবাস করেন। বাচ্চারা সবাই লেখাপড়া করছে। তাদের নাম এই ঃ মনসূরা ফারহাত (১৫) মেট্রিক ক্লাসে আছে। আদীল মুনাওয়ার (১৩) অষ্টম শ্রেণীতে আছে। ওক্কাস আহ্‌মদ (১২) সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। তৃতীয় ছেলে তৌসিফ আহ্‌মদ মুনাওয়ার (১১) ডাঃ সাহেবের শাহাদত বরণের পর জন্ম লাভ করেছিল। সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। আল্লাহ্ তাদের সকলকে দীন-দুনিয়ার নেয়ামতরাজীতে ভূষিত করুন।

নযীর আহ্‌মদ সাহেব সাকী, রফিক আহমদ সাহেব সাকেব এবং স্নেহ ভাজন নাবীলা (পিতা- মুশতাক আহ্‌মদ সাহেব) এ তিনজনই গুজরাত জেলার অন্তর্গত চক সিকান্দরের অধিবাসী। তাদের শাহাদতের ঘটনা এই যে, নযীর আহ্‌মদ সাকী ১৯৫৩ সালে মুকার্‌রম মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেবের ঔরশে চাক সিকান্দরে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মগত আহ্‌মদী ছিলেন। তাঁর পিতামহ মুকার্‌রম দুল্লাখান সাহেব (রাঃ) এবং দাদা মুকার্‌রম কালে খান সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মোকাদ্দমা উপলক্ষ্যে ঝিলাম অবস্থানকালে তাঁর হাতে বয়াত হয়ে আহ্‌মদীয়া সিলাসিলায় দাখিল হয়েছিলেন। শহীদ নযীর আহ্‌মদ সাকী সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেছেন। খেলাড়ী এবং মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে তিনি এজন্য অবসর পেয়েছিলেন যে, একবার কোন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে গালমন্দ করতে শুনে তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি এবং তাকে ঘুষি মারেন। তাতে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এই মুষ্ঠাঘাতের বিষয়টি হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘুষি মারার ঘটনাকেই স্মরণ করায়। তখনই তাঁকে গ্রেফতার এবং কোর্ট মাশাল করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অলৌকিকভাবে তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করে পেনশন ইত্যাদি সহ অবসর দেয়া হয়। আসলে শাহাদত লাভ তাঁর তক্বদীরে ছিল সেজন্যেই ঐ যাবতীয় ব্যবহার তাঁর ক্ষেত্রে করা হয়।

দ্বিতীয় শহীদ মুকাররম রফিক আহ্‌মদ সাকেব ১৯৫২ সালে চকসিকান্দরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান মুহাম্মদ সাহেব এবং মাতার নাম ছিল ফতেহ্ বেগম সাহেবা। শহীদ রফিক সাহেব জন্মগত আহ্‌মদী ছিলেন। তাঁর পিতামহ মুকাররম মুহাম্মদ বুটা সাহেব এবং দাদা মুকার্‌রম মুহাম্মদ বখ্‌শ সাহেবও ঝিলামেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন। শাহাদতের ঘটনার সময় ছুটিতে বাড়ী এসেছিলেন। শহীদ নাবীলা (পিতা মুশতাক আহ্‌মদ সাহেব) চকসিকান্দরে জন্ম গ্রহণ করে এবং ১০ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করে প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যায়। উল্লেখিত সকলের শাহাদত ১৬ জুলাই, ১৯৮৯ ইং তারিখে সংঘটিত হয় যখন বিরুদ্ধবাদীরা চকসিকান্দরের ওপর চতুর্দিক হ'তে চড়াও হয়। এই হামলা চলাকালীন আহ্‌মদীদের প্রায় ৬৪টি গৃহ পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং প্রকাশ্যে লুট-তরাজ করা হয়।

মুকার্‌রম শহীদ নযীর আহ্‌মদ সাকী তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে যান। দু'জন মেয়ের বিয়ে হয়েছে। অবশিষ্ট সন্তানরা শহীদ নযীরের মায়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। দ্বিতীয় শহীদ রফিক আহ্‌মদ সাকেব শোকাহত স্ত্রী, ছয় মেয়ে এবং দুই ছেলে রেখে যান, যারা এখন রাবওয়ায় বসবাস করছেন।

মুকার্‌রম ডাঃ আব্দুল কদীর জাগ্‌রান সাহেব ২রা আগষ্ট ১৯৯৮ ইং শাহাদত বরণ করেন। তিনি তিলওয়ান্তী, ঝুমরা নিবাসী হযরত রহীম বখ্‌শ সাহেব ও বরকত বিবির ঔরশে ১৯২৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ৩১৩ জন সাহাবার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের কোর্স পাশ করেন এবং জীবন ওয়াক্‌ফ করে কিছুকাল নাসেরাবাদ এস্টেটের ডিস্পেনসারীতে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর প্রথমে তাঁর ভাই শহীদ আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের কাছে নওয়াবশাহে থাকেন, তারপর নওয়াবশাহ্ জেলার কাজী আহ্‌মদে (স্থানের নাম) নিজের ক্লিনিক খুলে নেন। শাহাদত বরণ কালে কাজী আহ্‌মদ জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৮৪ সনে যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তখন তাঁর কাছে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে হুমকিমূলক একাধিক পত্র আসে এ মর্মে যে, তাঁকে তারা হত্যা করবে। কিন্তু তিনি ঐসব হুমকির আদৌ কোন পরোয়া করেন নি। বরং তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি শাহাদত লাভের জন্যে দোয়া করতে থাকেন। একদিন এক ব্যক্তি রুগী সেজে তাঁর ক্লিনিকে আসে এবং আসা মাত্র একাধিক গুলি বর্ষণ করে। আর ডাঃ সাহেব তখনই শাহাদতের মর্তবা পেয়ে যান। আবে-যমযমে ধৌত দু'টি কাফন তিনি মক্কা থেকে এনেছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ঐ কাফনেই যেন তাঁকে দাফন করা হয়। নীতিগতভাবে তো শহীদকে কাফন পরানো হয় না বরং রক্ত মাখা ঐ কাপড়েই দাফন করা হয়, যা পরা অবস্থায় তারা শাহাদত বরণ করে থাকেন। কিন্তু শহীদ ডাক্তার সাহেবের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে যেন মক্কা থেকে আনীত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়। এর ফলশ্রুতিতে তিনি যে কাপড়ে শহীদ হয়েছিলেন তা পুলিশ নিয়ে নেয় এবং বার-বার চাওয়া সত্ত্বেও তা ফেরত দেয় নি। সুতরাং অবশেষে তাঁকে আবে-যমযমে ধৌত কাফনেই সমাহিত করা হয়।

শহীদ তাঁর বিধবা স্ত্রী গোলাম ফাতেমা বেগম ব্যতীত চার পুত্র এবং এক কন্যা রেখে যান। মোহাম্মদ আব্দুস সামী জাগরান সাহেব বিবাহিত এবং আমেরিকায় চাকুরী করেন। আব্দুল হালীম জাগ্‌রান সাহেব পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ে এসিসটেন্ট কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। তিনিও বিবাহিত। আব্দুর রফিক জাগ্‌রান, এম. এস. সি. নুসরাত জাহান স্কীমের অধীনে জীবন উৎসর্গীকৃত হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ করেছেন। বর্তমানে কানাডায় বসবাস করেন। আমাতুল্লাহ্ খান সাহেবা বিবাহিতা এবং নওয়াবশাহে থাকেন। ডাঃ আব্দুল মুনীব জাগ্‌রান সাহেব বিবাহিত এবং নুসরত্ জাহান স্কীমের অধীনে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত জীবন ওয়াক্‌ফ করেন। তারপর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে নিজে আয়ারল্যান্ডে থাকেন এবং পরিবার-পরিজন লন্ডনে বাস করছে। নওয়াবশাহের ঐ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার, যে কিনা 'বে'রওয়ালে' পীরের মুরীদ ছিল এবং যার ইশারা-ইঙ্গিতেই অত্র এলাকার অধিকাংশ আহ্‌মদী ডাক্তারদের শাহাদত সংঘটিত হয়- এই জমিদারের মৃত্যু ভীতিপ্রদ শিক্ষা বহন করে থাকে। সুতরাং তার যুবক পুত্ররা পরস্পর পরামর্শ করে তাদের পিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে। গুলি খেয়ে সে অল্প একটু গাত্রোত্থান করলে তার স্ত্রী ও সন্তানরা মনে করে যে, গুলি তার লাগে নি, এবং এ ব্যক্তি যদি বেঁচে যায় তাহলে সে তাদেরকে জীবিত রাখবে না। সুতরাং তার স্ত্রী এবং পুত্ররা মিলিত হয়ে তার গলা ধরে চিপতে আরম্ভ করে এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ে নি, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার মৃত্যু সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হয়।

শহীদ ডাঃ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব (কাজী আহ্‌মদ-জেলা নওয়াবশাহ্) ২৮ সেপ্টেম্বর শাহাদত বরণ করেন। তিনি শহীদ ডাঃ আব্দুল কাদীর জাগ্‌রানের বড় ভাই। দেশ বিভাগের পর সিন্ধু প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং শাহাদতের সময় জেলা নওয়াবশাহের কাজী আহ্‌মদে বসবাস করতেন। ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি যথারীতি তাঁর ক্লিনিকে কাজ করছিলেন। এমতাবস্থায় এক রুগীকে দেখতে যেতে হয়। রুগী দেখে ফিরার পথে অজ্ঞাত পরিচয় তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন পিছন থেকে তার কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি চালায়। তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন। মানুষ তাঁকে উঠায় এবং যায়দি ট্রাস্টের এম্বুলেন্সে রেখে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে মৃত্যু বরণ করেন। কোন ব্যক্তি যিনি তাঁকে জানতেন টেলিফোনযোগে ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বাড়ীতে সংবাদ দেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

শহীদ মরহুম দুই কন্যা ও চার পুত্র রেখে যান। তাদের বিবরণ নিম্নরূপঃ আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা বিবাহিতা লাহোরে থাকেন। আব্দুল কাইয়ুম সাহেব এম. এস. সি বিবাহিত, নওয়াবশাহে বসবাস করেন এবং চাকুরী করেন। আব্দুস শুকূর সাহেব বিবাহিত। নওয়াবশাহে থাকেন এবং চাকুরী করেন। আব্দুল মাজেদ সাহেব বিবাহিত এবং করাচীতে চাকুরী করেন। আমাতুস্ সবুর সাহেবা এম.এ. তাহ্‌রীকে জাদীদের কারকুন মির্যা হাফীয আহ্‌মদের স্ত্রী রাবওয়ায় বাস করেন। সকল সন্তান আল্লাহ্‌র ফযলে দীনী ও দুনিয়াবী নেয়ামতে ভুষিত।

শহীদ মুবাশ্বের আহ্‌মদ সাহেব, তিমাপুর, কর্ণাটক (ভারত) ৩০ জুন ১৯৯০ ইং শাহাদত বরণ করেন। নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত যখন শতবার্ষিকী পূর্তি উদযাপন করলো, তখন তিমাপুর জামাতও যথামর্যাদাপুর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাতে আ-আহমদী বিরুদ্ধবাদীদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠলো এবং তারা দুষ্কৃতি ঘটাতে আরম্ভ করলো। ২৯ জুন কোন আহ্‌মদী খাতুনের মৃত্যুতে জানাযা উঠাবার জন্যে স্থানীয় মসজিদের ব্যবস্থাপনার কাছে (লাশ বহনের) 'ডোলী' চাওয়া হয়। তা দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। সেখানে জানাযা ডোলীতে করে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ। প্রত্যেক দেশ বা এলাকার এক একটা রেওয়াজ বা প্রথা থাকে। সেখানে আহমদী-অ-আহমদী তা সবসময় পালন করে থাকেন। পরবর্তী দিনে পুলিশ ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে পুনরায় অনুরোধ জানান হয়। কেবল তা প্রত্যাখ্যান করা হয় নি, বরং পূর্বরচিত পরিকল্পিনানুযায়ী ডোলী নেওয়ার জন্যে যে ক'জন আহ্‌মদী গিয়েছিলেন এক বিরাট সংখ্যক লাঠিয়াল দল

তাদের ওপর হামলা চালায়। এ হামলায় বেশ কয়েকজন আহ্‌মদী আহত হন। তাদের মধ্যে মুকাররম মুবাশ্বার আহ্‌মদ সাহেব ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন (*ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন*)। তাঁর উত্তর পুরুষদের মধ্যে কারও কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। এখন এই খুতবা শোনার পর হয়তো (তাদের কারও পক্ষ থেকে) কোন সংবাদ এসে যাবে। আসলে তা খুতবায় উল্লেখ করা যাবে না। তা রেকর্ডে যাবে।

শহীদ নসীর আহ্‌মদ আলভী সাহেব, দেওর-জেলা নওয়াবশাহ্। শাহাদত বরণের তারিখ ১৭ নভেম্বর, ১৯৯০। নসীর আহ্‌মদ আলভীর পিতা যিনি দওর, জেলা নওয়াবশাহ্‌র অধিবাসী ছিলেন নিজে আহ্‌মদী হয়েছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তারই পুণ্যময় তরবীয়তের সুবাদে তাঁর পুত্র নসীর আহ্‌মদ আলভী অন্যান্যদের কাছে আহ্‌মদীয়তের বাণী পৌছাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।তিনি বলতেন, প্রতিদিন আমি দু'চার জনকে তবলীগ করতে না পারলে আমার ভাত হযম হয় না। এই কারণে আহ্‌মদীয়ত বিদ্বেষী লোকেরা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কয়েকবার তারা তাঁকে হুমকিও দেয় যে, তিনি যদি তবলীগ হতে বিরত না হন তাহলে তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু সে হুমকীর কোনও পরোয়া করেন নি তিনি। এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন। ১৭ নভেম্বর, ১৯৯০-এর শনি ও রবিবারের মধ্যবর্তী রাত্রে ২টার সময় দু'ব্যক্তি তাঁর গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে, এবং একজন প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরে প্রবেশকারী দু'জনার একজন তাঁর মুখের ওপর বালিশ চেপে ধরে রাখে এবং আরেকজন তাঁর হৃদপিন্ডে গুলিবর্ষণ করে। তাঁর স্ত্রী শব্দ শুনে জেগে ওঠেন এবং দেখতে পান এক ব্যক্তি কিনা তাঁর স্বামীর মাথার ওপর ঝুঁকে আছে। তাকে তিনি (স্ত্রী) ধরার চেষ্টা করেন। সে তাঁকে কুনই মেরে নীচে ফেলে দেয় এবং দেয়াল ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যায়। স্ত্রী তাঁর স্বামীর ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখেন, জীবনের রেশ তখনও কিছু বাকী আছে। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ তার শোকাহত স্ত্রী ব্যতীত তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে যান। বড় মেয়ের সম্বড়িয়ালে বিয়ে হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়ে হোমিওপ্যাথির ফাইনাল পরীক্ষায় সারা দেশে শীর্ষ স্থান লাভ করেন। তাঁর বিবাহ টরেন্টো নিবাসী সফদর হুসেন সাহেবের সঙ্গে হয়েছে, রুখসতি এখনও হয় নি। পুত্র ইহ্‌সানুল হক আলভী, এনামুল হক আলভী ও আনওয়ারুল হক আলভী তিনজনই এখনও লেখা-পড়া করে।

মোহাম্মদ আশরাফ জেলা গুরজারাঁওয়ালার অন্তর্গত চৌহান নিবাসী ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে শাহাদত বরণ করেন। তিনি খোদ আহ্‌মদী হয়েছিলেন। খুব ত্বরিৎ উন্নতি করেন। আমাকে লিখতেন, "প্রাণ হাতে নিয়ে চলা-ফেরা করি, স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যতীত আমার এখন আর কেউ নেই।" তাঁকে ১৬ ডিসেম্বরের রাত্রিতে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণকারীরা প্রথমে ধোঁকা দিয়ে তাঁর আস্থা অর্জন করে। রাতে তাঁর গৃহে অবস্থান করে। আহার করে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তার চেহারা এবং মাথায় পিস্তলের গুলিবর্ষণ করে তাঁকে শহীদ করে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তাঁর স্ত্রী শাহাদতের সংবাদ পার্শ্ববর্তী গ্রামে পৌছাবার জন্যে তাঁর ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সবাই সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু খোদার পথে প্রাণ বিসর্জনকারীর ঐ পুত্র তাদেরকে আশ্বস্ত করতে থাকেন এই বলে যে, 'আমার পিতা শুভ পরিণামে উপনীত হয়েছেন। আমার মা-ও তাতে সন্তুষ্ট।' শহীদ তাঁর বিধবা স্ত্রী ব্যতীত দুই কন্যা এবং ছয়পুত্র রেখে যান। তারা সবাই এখনো লেখা-পড়া করে। তাদের নামের বিবরণ ঃ ইশ্‌তিয়াক আহমদ সাহেব, এজায আহমদ সাহেব, ইফতেখার আহ্‌মদ সাহেব, তাহের আহ্‌মদ সাহেব, খুররম শাহ্‌যাদ আহ্‌মদ সাহেব, সালেহা আশরাফ সাহেবা এবং সাঈদা আশরাফ সাহেবা।

রানা রিযায আহ্‌মদ শহীদ, লাহোর। শাহাদত বরণের তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ ইং। তিনি ১৫ মার্চ, ১৯৫৪ ইং মোকাররম রানা আব্দুস সাত্তার সাহেবের ঔরশে জেলা দেহাড়ীর অন্তর্গত ২৯৯৫ই-বি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর বিল্ডিং মেটেরিয়ালের ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একজন সাহাবী হযরত কাযী গোলাম কাদের (রাঃ)-এর জামাতা হবার গৌরব লাভ করেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় আহমদীয়তের দশজন বৈরী বিরুদ্ধবাদী তাঁর পিতা রানা আব্দুস সাত্তার সাহেব, যিনি একজন তেজস্বী দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন, তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং মারধর করার পর তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে রানা রিয়ায আহ্‌মদ সাহেব তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে এক নরাধম খুব কাছে থেকে তাঁকে গুলি করে। তাঁর মাথায় গুলি লাগাতে তিনি সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েন। দু'দিন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তিনি ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর মওলার সান্নিধ্যে চলে যান এবং মৃত্যুর ওপরে চিরস্থায়ী জীবন বিজয় লাভ করে। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। তাঁর শাহাদতের চার মাস পর তাঁর স্ত্রী-ও মারা যান (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তিনপুত্র ও পাঁচ কন্যা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে জীবিত রয়েছে এবং এখনো লেখা-পড়া করছে। দুই ছেলে ওয়াক্‌ফে-নও স্কীমেও শামিল রয়েছে। শহীদ মরহুম তাঁর ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। তাঁর ৫ ভাই এবং ২ বোন রয়েছেন। এক ভাই রানা ইরসাল আহ্‌মদ সাহেব সিলসিলার মুরব্বী এবং বর্তমানে জামেয়া আহ্‌মদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে খিদমত পালন করছেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি তিনি।

শহীদ আহ্‌মদ নসরুল্লাহ্ সাহেব, লাহোর। তাঁর শাহাদত বরণের তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারী ,১৯৯৪ইং। তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী মুকাররম ডাঃ ইজাযুল হক সাহেবের পুত্র এবং হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ যাফরুল্লাহ্ খান (রাঃ)-এর নাতি। তিনি তাঁর মা এবং লাহোর জামাতের আমীর চৌধুরী নসরুল্লাহ্ খান সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা আমাতুল হাই সাহেবার কাছে থাকতেন। তিনি অত্যন্ত সচ্চেতা পুণ্যবান সহজ-সরল গম্ভীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন, খোদার অনুগ্রহক্রমে মূসীও ছিলেন তিনি এবং প্রত্যেক আর্থিক কোরবানীতে অনেক অনেক অংশগ্রহণ করতেন। ফেব্রুয়ারীর রাতে তিনি তাঁর বাসভবনে নিদ্রাযাপন করছিলেন। এমতাবস্থায় ভেতরে ঢুকে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা তাঁকে শহীদ করে বাইরে থেকে দরোজায় তালা দিয়ে যায়। পরবর্তী দিন সন্ধ্যার সময় তাঁর শাহাদত সম্পর্কে জানাজানি হয়। ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাবওয়ায় সাধারণ কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। হুযূর বলেন, বুঝা গেল না, তিনি যেহেতু মূসী ছিলেন, সাধারণ কবরস্থানে কেন তাঁকে দাফন করা হল ? এ সম্পর্কে ওসীয়্যত দফতর থেকে খোঁজ নেওয়া আবশ্যক। ঐ সময় পুলিশী তদন্তের দরুন হয়ত বাধ্যবাধকতা ছিল। কোন সময় কবর থেকে বের করে লাশ পুনরায় দেখা হয়। কিন্তু পরে তো তাঁর শবাধার বেহেশ্‌তী মাকবেরায় স্থানান্তর করা উচিত।

শহীদ ওসীম আহ্‌মদ বাট্ সাহেব এবং শহীদ হাফীয আহ্‌মদ বাট্ সাহেব সামানাবাদ, জেলা ফয়সালাবাদ উভয়ের শাহাদত বরণের তারিখ হচ্ছে ৩০ আগষ্ট, ১৯৯৪ ইং। মুকার্‌রম ওসীম আহ্‌মদ বাট্ সাহেব ১৯৬৯ সালে মুকার্‌রম মোহাম্মদ রমযান বাট্ সাহেবের ঔরশে জন্ম গ্রহণ করেন। মিডল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। তারপর পাওয়ার মিলের কাজ শুরু করেন। জামাতের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে খুবই অংশগ্রহণ করতেন। নামায নিয়মিত আদায় করতেন এবং চাঁদায়ও অত্যন্ত নিয়মিত দিতেন। গরীবদের সাহায্য-সহায়তা করতেন তিনি।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ৩০ আগষ্ট '৯৪ ইং জনৈক মুশতাক তার সাথীদের সহ তাঁর ওপর এবং তাঁর ভাইদের ওপর হামলা চালিয়ে রাইফেলের গুলি বর্ষণ করে। তাথেকে একটি গুলি তাঁর হৃৎপিন্ড এবং আরেকটি তাঁর বাঁ পায়ে এসে বিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতকালে তাঁর বয়স ছিল ২৫ বৎসর এবং অবিবাহিত ছিলেন। উক্ত হামলার ফলশ্রুতিতে তাঁর বড়ো ভাই মুহাম্মদ আমান বাট্ সাহেব এবং তাঁর দুই চাচাত ভাই মুফীয আহ্‌মদ বাট্ সাহেব এবং আখতার করীম বাট্ সাহেবও মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁদের মাঝে হাফীয বাট্ সাহেব (পিতা আল্লা রাখ্‌খা বাট্ সাহেব) আর. এফ. হাসপাতাল পৌছার পর প্রাণ বিসর্জন করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। উভয়ে ৩১ আগষ্ট রাবওয়ার সাধারণ কবরস্থানে সমাহিত হন।

শহীদ হাফীয বাট্ একজন সহানুভূতিশীল, সামাজিক, মিশুক ও নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী ছিলেন এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌য় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন তিনি। বাজামাত নামায ব্যতীত তাহাজ্জুদও আদায় করতেন। সর্ববিধ চাঁদা আদায়ে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ছিলেন। শাহাদত বরণের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর বাবা-মা, ছয় ভাই এবং চার বোন। চারজন ভাইয়ের এবং তিনজন বোনের বিয়ে হয়েছে এবং দু'জন ভাই এখনো অবিবাহিত।

প্রফেসর ডঃ নাসীম বাবর সাহেবের শাহাদত বৃত্তান্ত ঃ তিনি ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে বসবাস করতেন। ১০ অক্টোবর, ১৯৯৪ ইং তারিখে শাহাদত বরণ করেন।

শহীদ প্রফেসর ডঃ নাসীম বাবর ১৯৫২ সালে ডাঃ সৈয়্যদ মুহাম্মদজী আহ্‌মদী ও সৈয়্যদা আমাতুল ওয়াহীদের ঔরশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি (ডঃ নসীম বাবর) শৈশবকাল থেকেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে পি.এইচ. ডি-এর জন্যে ওয়ারসায় টেকটিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং ডক্টরেট করার পর ১৯৮০ সনে দেশে ফিরেন। পোল্যান্ড অবস্থানকালে তিনি মোহ্‌তরম ডঃ প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেবের প্রতিষ্ঠান আই. সি. টি. পি-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং সেখানকার বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কোর্সে এডমিশান গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে সুইডেন, জার্মানী এবং ইটালীর আরও কয়টি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সুতরাং তিনি প্রতিবছরই কোন না কোন আন্তর্জাতিক ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করতে থাকেন। বার্লিনের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করতে থাকেন। বার্লিনের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে তিনি প্রায় একবছর ব্যাপী শিক্ষকতা করেন। উক্ত ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্কের দরুন Defects in Semi-conductors Materials এবং High Super Conductivity -এর ক্ষেত্রে তিনি এরূপ উত্তম প্রশংসাযোগ্য রিসার্চ (গবেষণা) করেন যে, জার্মানীর টেকটিক্যাল ইউনিভার্সিটি পাকিস্তানস্থ কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে তাঁর তত্ত্বাবধানে Semi-conductors Materials -এর ওপর উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি বিভাগ স্থাপনের অনুমতি দান করে। এ প্রসঙ্গে সকল ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং জার্মানী থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আমদানীও কার্যতঃ যখন শুরু হয়েছিল ঠিক তখনই তাঁর শাহাদত সংঘটিত হলো।

তিনি এফ.এস.সি. থেকে এম.এস.সি পর্যন্ত তাঁর ছাত্র-জীবন রাওয়ালপিন্ডিতে একজন উদ্যমশীল কর্মতৎপর খাদেম হিসেবে অতিবাহিত করেন এবং বিভিন্ন বিভাগে 'নাযেম' হিসেবে খিদমত পালন করেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১০ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং রাত সাড়ে দশ ঘটিকায় কলিং বেলের শব্দ শুনে তিনি যখন ঘরের দরজা খোলেন তখন বাইরে দরজার সামনে দাঁড়ানো এক মুখোশধারী ব্যক্তি ক্লাশিনকোফ থেকে দু'বার গুলিবর্ষণ করে। একটি গুলি তাঁর হৃৎপিন্ডে এবং আরেকটি ঘাড়ে বিদ্ধ হয়। দু'টো গুলিই তাঁর দেহ ভেদ করে দেয়ালে গিয়ে আঘাত করে। আততায়ী তৎক্ষণাৎ বাড়ীর পেছনে প্রাচীর টপকিয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই দুর্ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী তাঁর স্ত্রী মুকার্‌রমা তামকীন বাবর সাহেবার বর্ণনানুযায়ী আততায়ী শেলোয়ার কামিজ পরিহিত ছয়ফিট উঁচু বলিষ্ঠ দেহধারী লোক ছিল, তার চেহারা মুখোশ ঢাকা ছিল, তা থেকে শুধু দু'টো চোখ দেখা যাচ্ছিল। তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, তা থেকে গুলি ছোড়ার জন্যে দরজা খোলার আগেই সে লক্ষ্য স্থির করে রেখেছিল। সে কোন শব্দও করে নি, কোন কথাও বলে নি। পলক ফেলার নিমিষে ফায়ার করে পালিয়ে যায়। তাঁর বেগমের চিৎকারের শব্দ শুনে একজন প্রতিবেশী প্রফেসর মিঃ পরভেয দৌড়ে আসেন এবং ডাঃ নাসীম বাবরকে তাঁর মোটরকারে উঠিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে ডাঃ নাসীম শাহাদতের পেয়ালা পান করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ব্যতীত এক কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে যান। রীমা বাবর, সক্রাত বাবর এবং জব্রান বাবর তিনজন সন্তানই এখনো লেখাপড়া করে এবং বর্তমানে তাদের মায়ের সঙ্গে কানাডায় বসবাস করে। তাঁর এক বোন রুবীনা হাশমী সাহেবা এখানে লন্ডনে বাস করেন এবং খাওয়ার হাশমী সাহেবের স্ত্রী তিনি। তাঁর খালা তাহেরা সাহেবাও ইউ.কে জামাতের একজন নিষ্ঠাবতী সদস্যা এবং অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ইংলিশ বিভাগে চিঠি-পত্রের কাজ করেন।

তাঁর শাহাদতের ঘটনায় জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ব্যতীত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 'দ্যা নিউজ' রাওয়ালপিন্ডি, সাপ্তাহিক 'পাল্‌য' ইসলামাবাদ এবং 'দ্যা মুসলিম' ইসলামাবাদ মুল্লাতন্ত্র ও আন্তঃধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য তাদের নিন্দাবাদ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন এবং শহীদ মরহুমের মৃত্যুতে তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনের কাছে গভীর শোক ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

আল্লাহ্‌তাআলা শহীদ মরহুমসহ তাদের সকলকে স্বীয় করুণাধারায় সিক্ত ও আশিসমন্ডিত করুন। এ শাহাদতটির বিবরণ সংক্ষেপে এটুকুতেই শেষ করছি। অবশিষ্ট অন্যান্য শহীদদের বিবরণ ইন্‌শাল্লাহ্ আগামী খুতবা থেকে শুরু করা হবে।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

সালানা জলসা উপলক্ষ্যে গুরুত্বপুর্ণ নসীহত

ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য যে, মুসলমানরা বহু পরিমাণ সত্য-স্বপ্ন, রূইয়া এমনকি আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যলাপের সৌভাগ্যও লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতে বাধ্য।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ৩০ জুলাই, ১৯৯৯ মসজিদে ফযল, লন্ডন]

ইউ,কে বার্ষিক জলসার প্রারম্ভে সূরা ইউনুস ৬৩, ৬৪ নং আয়াত পাঠ করে, হুযূর খুতবা ইরশাদ করেন। হুযূর (আইঃ) উল্লেখিত আয়াতসমূহের অনুবাদ নিম্নরূপ করেছেন ;

"শোন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধুরা এমন যে, তাদের জন্যে কোন ভয়ের কারণ নেই। আর না তারা দুঃখিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে ইহলৌকিক জীবনে তাদের জন্যে শুভ সংবাদ আর পারলৌকিক জীবনেও তাদের জন্যে শুভ সংবাদ। আল্লাহ্‌র বাণী অপরিবর্তনীয় এটাই সেই বড় সাফল্য।

এই আয়াতের তফসীর সম্পর্কে একটি হাদীস আছে। সর্বপ্রথম আমি এই হাদীসটি পড়ছি। সময়ের স্বল্পতার কারণে হাদীসের অনুবাদ কেবল পড়ছি। হযরত আবূ দরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বল্‌ল, "লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ্ দুনিয়া ওয়াফিল আখেরা" সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? হযরত আবূ দরদা জবাবে বললেন, তুমি এমন একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, যে সম্পর্কে এক ব্যক্তি ব্যতীত আর অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে শুনি নি। এ ব্যক্তিকে উত্তর দিতে গিয়ে আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, "এই পার্থিব জীবনে তাদের জন্যে 'বুশরা' তাদের ঐ সব সত্য-স্বপ্ন যা একজন মুসলমান স্বয়ং দেখেন অথবা তাদের জন্যে অন্য একজনকে দেখানো হয়ে থাকে এবং পরকালে তাদের 'বুশরা' হবে তাদের বেহেশ্‌ত"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, "এমন মানুষ যারা ঈমান এনেছে এবং অনুগত হয়েছে অতঃপর ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের ইহলৌকিক জীবনে এবং পরকালেও 'বুশরা'-শুভ-সংবাদ রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা সত্য-স্বপ্ন, ইলহাম, রূইয়া ও কাশ্‌ফের মাধ্যমে তাদের শুভ-সংবাদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌র অংগীকার অপূর্ণ থাকতে পারে না। এটা একটি বড় সাফল্য যা তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই সাফল্যের মাধ্যমে তাদের এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত না তারা উপরোক্ত সফলকাম ব্যক্তিবর্গের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।"

এই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "তাদের জন্যে ইহকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবাণী নাযেল হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন, *'যারা আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি ঈমান আনে যে, তিনিই তাদের প্রভু, অতঃপর তারা ঈমানের উপর দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। ফিরিশ্‌তারা ঐ ঈমানদারগণকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন, এই বলে যে, তোমাদের কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।'*

আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্যে এটি একটি বড় উপায় যে, নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়। কারণ যখন বহুকাল পর্যন্ত নিদর্শন প্রদর্শন করা হয় না তখন মানুষ নাস্তিক হয়ে যায় এবং বেহুদা কথা-বার্তা বলতে আরম্ভ করে।"

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় খন্ডে লিখেছেন, "ইহজীবনে তারা শুভ-সংবাদ লাভ করবেন অর্থাৎ তারা 'ইলহামী নূর' লাভ করবেন এবং শুভ-সংবাদ পাবেন যার মধ্যে তাদের জন্যে মঙ্গল, প্রশংসা ও সুনাম থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা এসব সত্যকে প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্‌তাআলা যে সব অংগীকার করেছেন সবগুলোই পূর্ণ হবে। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হবে না। এটি অনেক বড় সৌভাগ্য যা এমন সব মানুষ লাভ করে থাকেন, যারা হযরত নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্যত্র লিখেছেন, 'তাদের তৃতীয় লক্ষণ এই যে, তারা শুভ-সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ইহজীবনে এবং পরকালেও। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলার এই অংগীকার কখনও পরিবর্তন হয় না। তারা ঐশী-প্রেমের এই শ্রেণী প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের সাথে বাক্যলাপ করেন। সত্য-স্বপ্ন লাভ করেন। আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা অবশ্যই আল্লাহ্‌তাআলার সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাদের ওলী আল্লাহ্ হওয়ার বড় নিদর্শন বা লক্ষণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌আলার সাথে বাক্যলাপের সৌভাগ্য লাভ করেন।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'মুসলমানরা অনেক বেশী সত্য-স্বপ্ন লাভ করে থাকেন। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা এ সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে অংগীকার করে রেখেছেন এই বলে যে, "লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ্ দুনিয়া"-[তাদের জন্যে ইহজীবনে শুভ-সংবাদ রয়েছে]।

বিষয়টির গভীর সম্পর্ক রয়েছে আমার আগামী বক্তব্যের সাথে। কারণ আপনারা দেখবেন আল্লাহ্ তাঁর প্রকৃত সত্যবাদী মহাপুরুষদের কীভাবে অহরহ সত্য-স্বপ্ন বা রুইয়ার মাধ্যমে সমর্থন দিয়ে থাকেন। তদুপরি আমাদের জামাতের দ্রুত গতিতে ব্যাপক প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভের পিছনেও রয়েছে অগণিত ও অসংখ্য সত্য-স্বপ্ন বা রুইয়ার বিরাট বড়

প্রভাব। অনেক সত্য-স্বপ্ন প্রথমে দেখানো হয়। যার ফলে বহু লোক আহমদীয়তের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

অতঃপর বয়াতের পরেও নব-দীক্ষিতরাও অনেক সত্য-স্বপ্ন দেখেন যার ফলে তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা আসে। মোটকথা, এভাবে আমাদের এ ব্যাপারটা বেড়েই চলেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, ইসলামে অবিশ্বাসী এবং অস্বীকার কারীরা কখনও এত বেশী পরিমাণে সত্য-স্বপ্ন লাভ করতে পারে না। বরং তারা এদের তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগও লাভ করে না। একথার সত্যতা আমাদের ঐ সমস্ত হাজার হাজার সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে প্রমাণ হবে, "যে সব স্বপ্ন বাস্তব রূপধারণ করার পূর্বেই আমরা শত শত মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছি। এই প্রতিযোগিতায় অমুসলিমদের অক্ষমতা ও অপারগতা আমি আমার দাবীর আরম্ভ থেকেই ঘোষণা করে আসছি"।

এই বিষয়টিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বারবার বর্ণনা করেছেন। আজকের খুতবায় বিষয়টির মূল কথাগুলো বলা হয়ে গেছে। অতএব, এ বিষয়ে আরো অনেক উদ্ধৃতি পড়ে শোনানোর বেশী প্রয়োজন নেই বলে মনে করি।

এবার আমি সংক্ষেপে এই খুতবার মাধ্যমে আজকের জালসায় আগত মেহমানদের এবং যারা মেহমানদারীর দায়িত্বে কর্মরত আছেন। সবাইকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি। এভাবে জুমুআর পর্ব সমাপ্ত হবে। তারপর যথাসময়ে আমরা জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একত্রিত হব, ইনশাল্লাহ্।

এ সম্পর্কে বারবার যে নসিহতের (হিতোপদেশ) পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে তা হচ্ছে ধৈর্য এবং ধৈর্যের উপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকা। ধৈর্যের পরও ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে। সারাংশ এটাই। কথা প্রসঙ্গে এ কথাও বলে দিতে চাই যে, আহমদী শহীদগণের বিবরণ পর্ব সমাপ্ত করেছিলাম, গত খুতবায়, কিন্তু কিছু ঘটনা পরে জানতে পেরে আমি দুঃখিত হয়েছি যে, এ ঘটনাগুলো পূর্বে কেন আমাকে জানানো হয় নি।

এমন গৌরবোজ্জল ঘটনা যা অবশ্যই খুতবায় স্থান পাওয়া উচিত ছিল। জানি না কেন তাদের আত্মীয়-স্বজনরা কি ধরনের গাফিলতির ঘুমে ঘুমন্ত ছিলেন-- পূর্বে সময় মত জানালেন না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ ঘটনাগুলো অবশ্যই খুতবায় বর্ণিত ঘটনাসমূহের বাইরে থাকবে না। বরং খুতবায় বর্ণিত শহীদদের ঘটনাবলী যা একত্রে ছাপানো এবং প্রকাশ করা হবে তার মধ্যে যথাস্থানে এগুলোকেও সন্নিবেশিত করা হবে। নীচে টীকার মাধ্যমে লিখে দেয়া হবে যে, এই ঘটনা খুতবায় বর্ণনা হওয়া থেকে বাদ পড়েছিল। কিন্তু গুরুত্বের কারণে এগুলোকে এভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এবার কতকগুলো দিক-নির্দেশনা এবং উপদেশ মেহমান (অতিথি) এবং মেযবানদের (অতিথি আপ্যায়নকারীদের) উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি। বার্ষিক জলসায় আগত মেহমানদের পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান এবং ভালবাসা প্রদর্শন করবেন। মেহমানদের নিরলস নিঃস্বার্থ খেদমত (সেবা-যত্ন) করবেন। মেহমানদের খেদমত মানুষের সহজাত স্বভাব-প্রকৃতি প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এতে কোন কৃত্রিমতা নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রকৃতি প্রদত্ত এই স্বভাব গুণে গুণান্বিত হয়ে মেহমানদের রাত দিন সেবা-যত্ন করে গেছেন। হযরত (আঃ)-এর বসতবাটী পুরোটাই একটা অতিথিশালার মত ছিল। যতদূর সম্ভব মেহমানদের সাথে বসে খাবার খেতেন। সবাই যা খেতেন হযরত (আঃ)-ও তাই খেতেন। পরবর্তীকালে অসুখের কারণে বাড়ীর ভেতরে খেতেন। কিন্তু সেখানে কোন প্রকার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ছিল না কখনও। আমরা আজও জলসার সময় চেষ্টা করে যাচ্ছি, হযরত (আঃ)-এর নমুনাকে প্রচলিত রাখতে। এখানে একটু ভুল ধারণা থাকতে পারে যা দূর হওয়া উচিত। যারা বিশেষ করে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বহির্বিশ্ব থেকে এসেছেন অধিকাংশই অ-আহমদী। অথবা আহমদী হলেও তাদের জন্যে খাদ্য পরিবেশনের প্রতি খাস দৃষ্টি রাখতে হয় যেন তাদের অপসন্দ কিছু যেন পরিবেশন না করা হয়। এটাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আচরণ বিধির অন্তর্গত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ও যারা বহির্জগৎ থেকে আসতেন তাঁদের সম্মান ও তাঁদের অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। যতদূর সম্ভব হত তাদের সেবা-যত্ন করা হতো। অতএব, কোন আহমদী যেন একথা মনে না করেন যে, কিছু মেহমানদের জন্যে বিশেষ সেবা-যত্ন কেন করা হয়েছে। তাদের জন্যে পৃথক বিশেষ-ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা এ রকম ব্যবস্থার উপযুক্ত মেহমান। অতএব, একথা সবাই স্মরণ রাখবেন যে, সকলের জন্যে একই খাদ্য পরিবেশন করা হবে। কিন্তু যাদের জন্যে বিশেষ-ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন মত সেগুলো বিতরণ করা হবে। অনেকে কাশ্মীর থেকে এসেছেন, অনেকে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, এরা ভাত খেতে পসন্দ করেন। এদের জন্যে ভাতের ব্যবস্থা আছে। চেষ্টা করা হয়েছে যে, যতদূর সম্ভব সকলের প্রয়োজন যেন পূরণ করা সম্ভব হয়।

ইংল্যান্ডের আহমদীরা বেশী বেশী খেদমতের কাজে ব্যস্ত থাকবেন। কিন্তু তারপরও তাদের উচিত খেদমতও করবেন জলসাও শুনবেন। খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে তারা যেন জলসা শোনা থেকে বাদ না পড়েন। ইংল্যান্ডের জামাত অনেক বড় খেদমতের দায়িত্বভার বহন করছে। অনেক মেহমান তাদের বাস গৃহেও অবস্থান করে। অথচ জলসার দৃশ্য সামগ্রিক দেখা যাবে না। এত বড় সংখ্যা যে বাড়ীতে স্থান সংকুলান সম্ভব হয় না। মেহমানরা কামরার মধ্যে এভাবে ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করেছেন যে, কেউ দরজা খুলতে গেলে একজনকে উঠে দাঁড়াতে হয় নতুবা দরজা খোলা যায় না। এভাবেই জলসার দিনগুলি অতিবাহিত হয়। আর এতে যে আনন্দ ও তৃপ্তি তা প্রশস্ত ঘরে লাভ করা যায় না। যারা অভিজ্ঞতা রাখেন তারাই একমাত্র জানবেন। অতীতে আমারও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমিও সুযোগ পেতাম। কিন্তু এখন অবস্থা বদলে গেছে।

যাই হোক ঘটনা এই যে, *মেহমানদের খাতিরে আপনাদের হৃদয়ের দুয়ার বেশী করে খুলে দেয়া উচিত। খেদমত করা উচিত কিন্তু খেদমত যেন আপনাকে জলসা থেকে বঞ্চিত না রাখতে পারে। কারণ জলসার আধ্যাত্মিক খোরাক খাওয়া উভয়ের জন্যই আবশ্যক। জলসার উদ্দেশ্য কেবল মেহমানদের খাবার খাওয়ানোই নয়।*

মেহমান এবং মেযবানদের সকলের জন্যে সাধারণ উপদেশ এই যে, আপনারা যিকরে ইলাহী ও দুরূদ শরীফ পাঠে সময় কাটাবেন। নামায বা-জামাতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। বাজে বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকবেন। পরস্পর ভদ্র ও মার্জিত কথা-বার্তা আস্তে আস্তে বলবেন। কড়া কথা বা কর্কশ কথা বলতে আপনারও কষ্ট হবে। যাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন তাকেও কষ্ট দিবে। সুতরাং স্মরণ রাখবেন- কড়া কথা বা কর্কশ কথা ভেতর থেকে বেরুতে দিবেন না। যখনই মনের ভেতরে এমন হবে তখনই তা চেপে যাবেন। আল্লাহ্‌র খাতিরে ধৈর্য ধারণ করবেন। এতে করে, আপনি নিজেও পরিষ্কার থাকবেন অন্যরাও পরিষ্কার থাকতে পারবেন।

জলসার সমস্ত অনুষ্ঠানমালা বড় ভালবাসা ভরা অন্তর দিয়ে শুনবেন। না'রা-বাজী থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরী। এবার আমি অনেক গবেষণা

করে, বহু বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইতো-পূর্বে যে ধরনের না'রা-বাজী হোত, একজন বলতেন, না'রায়ে তকবীর ! আপনারা সবাই সম্মিলিত হয়ে উচ্চস্বরে বলতেন, "আল্লাহু আকবর" । আমি পড়া শোনা করে জানতে পেরেছি যে, 'এ রীতি না তো হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রচলিত ছিল, আর না হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রচলিত ছিল। আমি বড় মনোযোগ দিয়ে গবেষণা করেছি। একটিও দৃষ্টান্ত বা ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় নি যে, এ ধরনের না'রা-বাজী ঐ যুগে কখনও দেখা গেছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায়।

'আল্লাহ্ আকবর' শব্দ তো মাঝে মাঝে উচ্চারিত হোত তখনও। কিন্তু এত বেশী জোরে নয় আস্তে আস্তে। মানুষের মন যখন আবেগ আপ্লুত হয়, তখন তো 'আল্লাহু আকবর' শব্দ উচ্চারিত হবেই। কারণ 'আল্লাহু আকবর' বলা ছাড়া তো আমাদের জীবনই বাকী থাকে না। অতএব, 'আল্লাহু আকবর' কিছু জোরে বেরিয়ে যায় তো এতে কোন আপত্তি নেই।

জলসার ব্যবস্থাপনা- কর্মীদের সাথে পূর্ণ আনুগত্য ও আন্তরিকতা পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আনুগত্য প্রদর্শন আবশ্যক। তিক্ত, আনুগত্য মোটেই উদ্দেশ্য নয়। এমন না যে বাধ্য হয়ে অগত্যা নিরুপায় হয়ে আনুগত্য করবেন। বরং এমন আনুগত্য প্রদর্শন করুন যার ফলে যার আনুগত্য করছেন সে যেন সন্তুষ্ট বা খুশী হয়। যার আনুগত্য করবেন তার যোগ্যতার কারণে আনুগত্য করছেন না বরং আল্লাহ্র খাতিরে তার আনুগত্য করছেন, মাথা নত করছেন তার সামনে। এটা সেই আনুগত্য যা একজন খাঁটী আহমদীর আসল চরিত্র।

পরিচ্ছন্নতা তো মোমেনের নিজস্ব ধরন। আঁ হযরত (সঃ) পরিচ্ছন্নতার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করছেন, এত বেশী আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন যে অন্য কোন ধর্মে এর কোন তুলনা নেই। বাহ্যিক এবং শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ওযু, গোসল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে হুযূর (সঃ) সবিস্তারে পরিচ্ছন্নতার আদেশ দিয়েছেন। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার সাথে অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক পবিত্রতার গাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, যদি অন্তর পবিত্র করতে চান তবে শরীর পরিষ্কার রাখুন। নিজে পরিষ্কার থাকুন। অন্য ভাইদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। দেখুন ! হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আগমনকারীদের জন্যে আগমনের স্থানকে পরিষ্কার রাখতে হবে। সুতরাং আপনারাও নিজের পরিবেশকে পুরোপুরি পরিষ্কার রাখুন।

আরো একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। *আপনারা খাবার নষ্ট হতে দিবেন না। হযরত রসূল (সঃ)-এর উপদেশ এই যে, আল্লাহ্র দান রিযক এর যথাযথ মূল্যায়ন কর।* পানি এবং খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আমি বার বার বলেছি। ইংল্যান্ডে যদি খাদ্য এবং পানির অপচয় না হোত তবে, এক্ষেত্রে আজ যে বিরাট ব্যয় হচ্ছে কিন্তু পরিবেশ দুষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে এর তুলনায় অতি অল্প ব্যয়, বরং বর্তমান ব্যয় এর ১/১০ এক দশামাংশ ব্যয়ে এদেশে আরাম ও স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতাম। কিন্তু এরা তো ঐ রসূলকে গ্রহণ করে নি যিনি আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ)। *আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মদীন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লেম।*

ঐ মার্কি যেখানে খাবার পরিবেশন করা হবে, সেখানে খাবার পরে ব্যবহৃত প্লেট ইত্যাদি এ রকম যে ওগুলো ফেলে দিতে হয়, পুনরায় ব্যবহার করা হয় না। যেভাবে বলা হয়েছে আপনারা সেভাবেই করবেন। যদি বলা হয় যে, আপনারা নিজ নিজ প্লেট নিজেই ডাষ্টবিনে ফেলবেন তবে সেভাবেই করবেন। আর যদি বলা হয় যে, টেবিলে রেখে যাবেন সেচ্ছা-সেবকরা ফেলবেন তবে সেভাবেই করবেন। যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে করবেন।

পর্দা পালন করুন। অর্থাৎ দৃষ্টি অবনত রাখুন যেখানে মহিলারা চলাচল করে। কোন কারণে কোন মহিলা হয়ত মুখ না ঢেকে বেরিয়েছে। অনেকে তো মুখ না ঢাকলেও তাদের কাপড়-চোপড় এমন হয় যে, পর্দার কাজ করে। এমন মহিলা যারা মুখ ঢেকে আসে নি তাদের সাজ-গোজ মেকআপ জায়েয নয়। প্রতিবছরই বলেছি এবারও বলছি। আমাদের স্থানীয় লাজনার দায়িত্ব এমন এ ধরনের মহিলাদের বোঝাবার। পুরুষদের কাজ হবে না এমন মেয়ে যে মুখ ঢেকে আসে নি তাকে সম্বোধন করে কিছু বলা। এ কাজ স্থানীয় লাজনার কাজ। এমন মেয়েরা অনেকেই গয়ের আগমদী। এদের বেপর্দা দেখে আহমদীরা মন খারাপ করে ফেরৎ গিয়ে আমাকে লিখবে যে, "আমরা জলসায় বেপর্দা মেয়েদের দেখেছি আহমদীরা পর্দা করে না।" হয়ত কোন আহমদী মেয়েও এমন হতে পারে। কিন্তু লাজনার দায়িত্ব মেয়েদের বুঝাতে হবে সম্মানবোধ সহকারে যে, পর্দার খেয়াল করুন। এতে করে পুরুষ মহিলা উভয়ের মেহমান-মেযবান উভয়ের মঙ্গল হবে।

নামায বা-জামাত চলাকালে যদি কোন শিশু কান্না করে তাই মেয়েদের জন্যে পৃথক মার্কির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন মহিলা যাদের সাথে ছোট শিশুরা আছে তারা ঐ পৃথক মার্কিতে যাবেন। সুতরাং শিশুরা কান্না করলে তাদের পৃথক করতে হবে।

সবাই গোসলখানা পরিষ্কার রাখবেন। অনেক পাকিস্তানী এমন হতে পারেন যারা এখানকার গোসলখানা সম্পর্কে জানে না। আবর্জনা ফেলার জন্যে ডাষ্টবিন রাখা আছে গোসলখানার সাথে। আবর্জনা ভেতরে ফেলা যাবে না। নতুবা পায়খানার পাইপ বন্ধ হয়ে যাবে সকলের কষ্ট হবে। আশা করি সকলে এসব ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "কার পার্কিং" । গাড়ী দাঁড় করানো। এখানে জলসাগাহে তো আপনারা দেখছেন স্বেচ্ছা সেবকরা গাড়ী ঠিকমত দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করছে। আপনারা সহযোগিতা করছেন। ভবিষ্যতেও করবেন ইন্শাল্লাহ্। সমস্যা হয় লন্ডনে। কেউ কেউ এমন জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে আসেন যে, প্রতিবেশীর রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তাদের কষ্ট হয়। যদি তারা জানতে পারে যে, আহমদী জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন এবং এভাবে গাড়ী পার্ক করেছেন তবে তারা আরো খারাপ ধারণা নেয়। অতএব কোন অবস্থাতেই আপনারা গাড়ী ভুলক্রমে ভুল স্থানে রাখবেন না। কাউকে কষ্ট দিবেন না। কারো রাস্তা বন্ধ করে গাড়ী দাঁড় করবেন না। **জায়গা না পান দূরে গাড়ী রেখে পায়ে হেঁটে আসবেন। কিন্তু নিজের সুবিধার খাতিরে অন্যকে কষ্ট দিবেন না।**

যারা মেহমান তারা অন্যান্য বিষয়ে যেমন দৃষ্টি রাখবেন তেমনই আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন। অন্যান্য বছর বহিরাগত সংখ্যাও পাঁচ ছ'হাজারের কাছাকাছি থাকত। এবার কেবল জার্মানী থেকেই ছয় হাজার লোক আসছেন বলে অনুমান করা হয়েছে। সকলকে সকল সুবিধা দেবার ব্যবস্থা এবং চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হবে। তারপরও এবার সংখ্যা বেশী হবার কারণে হয়ত কোন কোন ব্যাপারে কিছু কষ্ট বা অসুবিধা আপনাদের হতে পারে। হয়ত জায়গা কম হবে বা অন্য কোন অসুবিধা হতে পারে। যদি কষ্ট হয় তবে ধৈর্য ধারণ করবেন। এটাও আল্লাহ্র খাতিরে ধৈর্য ধারণ করা হবে। আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালে পুরস্কৃত করবেন। মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তারপর সবাই নিজ নিজ গৃহে ফেরত চলে যাবেন। মঙ্গল মত যাবেন। আশা করি জলসার সুখকর স্মৃতি নিয়ে ফেরৎ যাবেন।

যদি কেউ ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেন তবে নিজেদের মধ্যে চর্চায় লিপ্ত হবেন না, বরং আপনার মেহেরবানী হবে যে, যথাসময়ে আপনি কর্তৃপক্ষকে খবর দিবেন।

যারা জলসায় যোগদানকে কেন্দ্র করে ভিসা নিয়েছেন তারা অবশ্যই ফেরত যাবেন। বৃটিশ সরকার জলসার কারণে যাদের ভিসা দিয়েছে তারা কোনমতেই প্রতারণা করতে পারবেন না। কোন মতেই এমন করা জায়েয হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, আমরা জলসার কথা বলি নি। তারা এমনেই ভিসা দিয়েছেন। এ অজুহাত যুক্তিসংগত হবে না। তারা আপনাকে জলসা উপলক্ষ্যেই ভিসা দিয়েছেন। আপনাদের প্রত্যাবর্তন একান্ত জরুরী। এভাবে হিজরত হয় না। এটা হিজরত হয় না বরং পাপের কাজ। রোজী-রোজগার বা অন্য কোন কারণে এসেছেন। কিন্তু জলসার নামে আপনারা এখানকার সরকার থেকে সুবিধা ভোগ করছেন। অথচ সরকারের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আশা করি এমন একজনও হবেন না বা একটি ঘটনাও ঘটবে না। একটি ঘটনাও এমন ঘটা উচিত নয়। ফেরৎ যাবার সময় হলে ফেরৎ যাবেন। ফেরৎ গিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করুন। আল্লাহ্ আপনার জন্যে ব্যবস্থা করবেন, ইনশালাল্লাহ্।

অবশেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে খুতবা শেষ করছি ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমাদের জলসা উপলক্ষ্যে যাত্রা করবেন আল্লাহ্ তাদের সহায় হউন। আল্লাহ্ তাদের অনেক বড় পুরস্কার দিন। তাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন। তাদের কষ্ট এবং দুঃখজনক অবস্থাকে তাদের জন্যে সহজ করে দিন। তাদের দুঃখ-কষ্ট দুর করুন। তাদেরকে সকল প্রকার কষ্ট থেকে উদ্ধার করুন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। পরকালে আল্লাহ্ নিজ প্রিয় বান্দাদের সাথে তাদের উত্থান করুন যাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এবং করুণা বর্ষিত হচ্ছে। যেন তাদের যাত্রা শেষে তিনি তাদের খুশি হন।"

অতি উচ্চমার্গের তত্ত্ব কথা। "যেন তাদের সফর শেষে তিনি তাদের খলীফা হন।" অর্থাৎ তাদের স্থানান্তরে আল্লাহ্ তাদের খলীফা হোন। তাদের ফেলে যাওয়া বিষয়াদির রক্ষাণাবেক্ষণ আল্লাহ্ করবেন। যারা পেছনে রয়ে গেছেন তিনি তাদের অভিভাবক হোন। সহায় হোন। অনেক সময় একজন মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা হন। অনেক সময় একজন মানুষের খলীফা আল্লাহ্ হন। অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথা। অতঃপর হুযূর (আঃ) দোয়া করেছেন ; "হে আল্লাহ্ ! মহামহিমান্বিত খোদা, হে অনুগ্রহ প্রদানকারী খোদা, হে রহীম (দয়ালু) খোদা, যিনি কষ্ট দূর করেন সেই খোদা ! আমার সকল দোয়া কবুল কর। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় আমাদিগকে উজ্জ্বল নিদর্শনসহ বিজয় দান কর। হে আল্লাহ্ তুমি সকল ক্ষমতার অধিকারী, আমীন। সুম্মা আমীন।"

অবশেষে আবার আমি একবার সাবধানতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি যা বার বার বলেছি। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল মত এখানে এনেছেন। আশা করি কারো কোন কষ্ট হয় নি। ফেরৎ যাবার সময় সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে যাবেন। প্রত্যেকে আপনারা নিজে দায়িত্ববান থাকবেন যারা মোটর কারে যাত্রা করবেন। কেউ ক্ষমতার বাইরে নিজের উপর ভারী চাপ নিয়ে সফর করবেন না। **ঘুম পেলে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ঘুমিয়ে নিবেন। তারপর সফর করবেন। প্রত্যেক কারে যে উপদেশ লিখে দেয়া আছে সেগুলো স্মরণ রাখবেন**।

অতঃপর হুযূর (আইঃ) ক্রন্দনরত ভারী কণ্ঠে বলেন, আমি আপনাদের সকলকে খুব ভালবাসি। **খাঁটী অন্তঃকরণে প্রকৃতই আমি আপনাদের ভালবাসি। আমি সুনিশ্চিত বলতে পারি। আপনাদের কষ্ট আমাকে অনেক বেশী কষ্ট দেয়। আল্লাহ্‌র নামের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা আমার কষ্ট দুর করার জন্যে হলেও ঐসব সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আমার উপর আপনাদের অনুগ্রহ হবে**। এখানেই খুতবা শেষ করছি। নামাযের জন্যে প্রস্তুত হন।"

অনুবাদক- **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
সদর মুরব্বী

সংবাদ

সন্তান লাভ

❑ মহান স্রষ্টার অশেষ রহমতে গত ২৫/০৭/৯৯ইং রোজ রবিবার আমরা আরও একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছি। বর্তমানে নবজাত সন্তান ও তার মাতা সুস্থ আছেন। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট নবজাতকের উত্তম খাদেমে দীন হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম
ও মিসেস নাছিমা আসাদ

❑ অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌তালার ফযলে গত ২৩/০৮/৯৯ইং রোজ সোমবার ভোর ৩.৪৫ মিনিটে জনাব মাষ্টার মুহিউদ্দিন সাহেব এর বড় ছেলে জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ ২য় কন্যা সন্তান লাভ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে আজিমপুর মাতৃসদন হাসপাতালে মা ও শিশু দু'জনেই ভর্তি আছেন। তাদের সু-স্বাস্থ্য এবং রোগ মুক্তির জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট বিশেষ দোয়া প্রার্থী।

সালাহ উদ্দিন মাহমুদ
আজিমপুর, ঢাকা

শুভ বিবাহ

❑ আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে গত ২৭-০৮-৯৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মোসাম্মৎ সৈয়্যদা নাহিদ মমতাজ পিতা জনাব সৈয়্যদ মমতাজ আহমদ বর্তমানে ২২/১৩, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর সাথে জনাব সৈয়্যদ তৌফিক আহমদ পিতা-মরহুম সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম সাহেব, মীরবাড়ি, মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শুভ বিবাহ ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। উক্ত নিকাহ্‌র এলান করেন সদর মুরব্বী মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। নিকাহ্ শেষে দোয়া করান ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব।

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য যে, কনে আমাদের জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ওয়াকফে জিন্দেগী সদর মুরব্বী মরহুম মাওলানা সৈয়্যদ এজাজ আহমদ সাহেবের নাত্‌নী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুইটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারের মধ্যে এই রিশ্‌তা যেন সব দিক থেকে বা-বরকত হয় তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা হলো।

আব্দুল কাদের ভূঁইয়া
সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা

❑ আমার চতুর্থ মেয়ে রুনা আখতারের শুভ বিবাহ চট্টগ্রাম নিবাসী মরহুম জনাব বদরুদ্দিন সাহেব (মন্টু বাবু)-এর দ্বিতীয় ছেলে নাসের আহমদের সাথে ৬০,০০১ (ষাট হাজার এক) টাকা দেন মোহরে গত ২০শে আগস্ট শুক্রবার চট্টগ্রাম মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন সদর মুরব্বী মহতরম ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। সবার খেদমতে দোয়ার আবেদন করছি।

খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনু মিয়া)
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

অমৃতবাণী

(৪র্থ পাতার পর)

খোদাতাআলা তাহার উপর স্বীয় 'ফযল' (আশিস) করিবে, তখন সে প্রকৃত খুশী ও আনন্দ লাভ করিবে। তখন হইতে সে নামাযে স্বাদ ও আনন্দ পাইতে আরম্ভ করিবে। যেভাবে সুস্বাদু খাদ্য আহার করিলে মজা লাগে, এইভাবেই রোদন ও কান্নাকাটিতে মজা আসিবে। নামাযের এই যে অবস্থা, ইহা তখনই সৃষ্টি হইয়া যাইবে। ইহার পূর্বে স্বাস্থ্য লাভের জন্য মানুষ যেভাবে তিক্ত ঔষধ খায়, সেভাবে এই বিস্বাদ নামায পড়া ও দোয়া চাওয়া জরুরী। এই বিস্বাদের অবস্থায় এই কথা মনে করিয়া যে, ইহাতে স্বাদ ও মজা সৃষ্টি হইবে, এই দোয়া কর, হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে দেখিতেছ আমি কীরূপ অন্ধ ও চক্ষুহীন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি অল্প কিছুক্ষণ পর আমার ডাক আসিবে। তখন আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। তখন আমাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ ও অজ্ঞ। তুমি ইহার উপর এইরূপ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ কর যেন ইহাতে তোমার আসক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হইয়া যায়। তুমি এইরূপ ফযল কর যেন আমি অন্ধ হইয়া না উঠি এবং অন্ধদের সহিত গিয়া মিলিত না হই। যখন এই ধরনের দোয়া ভিক্ষা করিবে এবং ইহাতে সব সময় লাগিয়া থাকিবে তখন তুমি দেখিবে যে, তোমার উপর একটি সময় আসিবে যখন এই বিস্বাদের নামাযে একটি বস্তু আকাশ হইতে তোমার উপর পড়িবে যাহা আবেগ সৃষ্টি করিয়া দিবে" (আল্ হাকাম, খন্ড ৭ তারিখ ঃ ১০ জানুয়ারী, ১৯০৩ পৃঃ পৃঃ ১১)।

"নামায পড়। নামায পড়। ইহা সকল সৌভাগ্যের চাবি। যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন এইরূপ করিও না, যেন একটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেছ। বরং নামাযের পূর্বে যেভাবে এক বাহ্যিক ওযূ কর, তেমনিভাবে এক অভ্যন্তরীণ ওযূ কর এবং নিজের শরীরের অঙ্গ হইতে 'গয়ের উল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু)-এর ধারণা ধুইয়া ফেল। তারপর এই দুইটি ওযুর সহিত দাঁড়াইয়া যাও। নামাযে অনেক দোয়া কর এবং কান্নাকাটি করা ও কোঁকাইয়া কাঁদা নিজের অভ্যাসে পরিণত কর, যাহাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়" (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩, পৃঃ ৫৪৯)।

"ইবাদত প্রকৃতপক্ষে ইহাকে বলে যে, মানুষ সকল প্রকারের কাঠিন্য ও বক্রতা দূর করিয়া হৃদয়ের জমিকে এইরূপ পরিষ্কার করিবে, যেভাবে কৃষক জমিকে পরিষ্কার করে। আরববাসীরা বলে, **'মাত্তরুন মু'আব্বাদুন'** যেভাবে সুরমাকে মিহি করিয়া চোখে লাগানোর উপযুক্ত করিয়া নেওয়া হয়। তদ্রূপেই যখন হৃদয়ের জমিতে কোন কাঁকর, পাথর, আবর্জনা না থাকে এবং এইরূপ পরিষ্কার হয় যেন আত্মাও কেবল আত্মাই অবশিষ্ট থাকে তখন ইহার নাম হয় ইবাদত। যদি আয়নাকে এইরূপ সাফ-সুত্‌রা ও পরিষ্কার করা হয় তবে ইহাতে চেহারা দেখা যায়। যদি জমিকে এইভাবে সাফ-সুত্‌রা করা হয় তবে ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন হয়। অতএব মানুষ, যাহাকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে যদি হৃদয়কে পরিষ্কার করে এবং উহাতে কোন প্রকারের বক্রতা, ময়লা, কাঁকর ও পাথর না থাকিতে দেয় তবে ইহার মধ্যে খোদা দৃষ্টিগোচর হইবে। আমি আবার বলিতেছি, আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসার বৃক্ষ হইতে সৃষ্টি হইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিবে এবং ঐ সুমিষ্ট ও পবিত্র ফল ইহাতে লাগিবে, যাহা **উকলাহা দায়েমুন** (অর্থ ঃ - যাহার ফল চিরস্থায়ী-অনুবাদক)-এর প্রতীক হইবে। স্মরণ রাখ, ইহাই ঐ মকাম যেখানে সুফীদের পুণ্যকর্মের পরিসমাপ্তি হয়। যখন পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে পৌঁছিয়া যায় তখন কেবল খোদারই জ্যোতির্বিকাশ দেখে। তাহার হৃদয় খোদার আরশ হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌তাআলা তাহার উপর অবতীর্ণ হন। পুণ্যকর্মের সকল গন্তব্যস্থল এখানে আসিয়া শেষ হইয়া যায় যেখানে মানুষের উপাসনার অবস্থা ঠিক হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক বাগান তৈরি হইয়া যায় এবং আয়নার ন্যায় খোদা দৃষ্টিগোচর হন। এই মকামে পৌঁছিয়া মানুষ পৃথিবীতে জান্নাতের নমুনা লাভ করে এবং এখানেই **হাযাল্লাযী রুযিকৃনা মিন ক্বলু ওয়া উতুবিহী মুতাশাবিহা** (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২৬, অর্থ ঃ ইহাতো সেই রিয্‌ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে-অনুবাদক) বলার স্বাদ ও মজা উপভোগ করে। মোট কথা, উপাসনার অবস্থা সঠিক করার নাম ইবাদত" (আল্ হাকাম, খন্ড ৬, তারিখ ২৪ জুলাই, ১৯০৩, পৃঃ ৯ ও ২৬)।

কৃতী ছাত্রী

❑ সুরাইয়া পারভীন নামে আমার এক আহমদী বোন ১৯৯৯ সালে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ২টি লেটার সহ স্টার মার্ক পেয়েছে। সে যাতে দীন ও দুনিয়ার উত্তম খেদমত করতে পারে সেজন্য সে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী। উল্লেখ্য যে, সে পিতা-মাতার একমাত্র আহমদী সন্তান। সে যাতে তার পিতা-মাতাকে আহমদীয়তের ছায়াতলে আনতে পারে সে জন্য সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

আহসান শরীফ
খুলনা জামাত

কৃতী ছাত্রী

❑ আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এ বছর আতিয়া তুল হাই (জুঁই) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ হতে মানবিক বিভাগে ২টি লেটার সহ স্টার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে পুনিয়াউট (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী বাবুল আহমদ চৌধুরী (ঢাকাস্থ আয়কর কর্মকর্তা)-এর প্রথমা কন্যা এবং মরহুম আহমদ রেজা চৌধুরী সাহেবের পৌত্রী ও (অবসর প্রাপ্ত) পোস্ট মাস্টার শেখ আব্দুল আলী সাহেবের দৌহিত্রী। তার ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

– শেখ আব্দুল আলী, বি.বাড়ীয়া

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৩৪ তম কিস্তি)

আরবের বাইরে ইসলামের বাণী

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন, 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমতরূপে। এ রহমতে তাঁর ব্যক্তি-সত্তা এবং শিক্ষা ও আদর্শ সব কিছুই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের মূল উৎস হলো আল্লাহ্ প্রেরিত পবিত্র কুরআন। এর বাণীর মাধ্যমে বিশ্ব-বাসীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হুযূর (সঃ) এবং প্রত্যেক মু'মিনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এজন্যে অবস্থা অনুযায়ী সুন্দর সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেয়াই বাহকের দায়িত্ব। কে গ্রহণ করবে, কে গ্রহণ করবে না সে দায়িত্ব যাদের কাছে বাণী পৌঁছানো হয় তাদের। বস্তুতঃ বাণী না পৌঁছানো পর্যন্ত গ্রহণ বর্জনের প্রশ্নই অবান্তর।

আঁ হযরত (সঃ) সাহাবীদের (রাঃ) কাছে রাজা-বাদশাহ্দের মোহর ছাড়া চিঠি-পত্র গ্রহণ করেন না। তাই তিনি একটি মোহর তৈরী করালেন। এতে তিনি খোদাই করে লিখালেন 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এবং আল্লাহ্তাআলার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আদবের খেয়াল রেখে তিনি সবচেয়ে উপরে লিখলেন 'আল্লাহ্' তার নীচে 'রসূল' এবং এর নীচে 'মুহাম্মাদ'। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে, মহরম মাসে হুযূর (সঃ)-এর পত্র নিয়ে বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হয়ে যান। পত্র পাঠানো হয় অনেক রাজা-বাদশাহ্র কাছে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো যেমন রোমান সম্রাট কায়সার, পারস্য সম্রাট, মিশরের রাজার নামে (মিশর ছিল কায়সারের আশ্রিত রাজ্য), আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর নামে। এসব পত্রাদি সংক্রান্ত কিছু গুরুত্ববহ বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে।

কায়সার-এ-রোম হিরাক্লিয়াস-এর নামে পত্র

সাহাবী দেহ্ইয়া কলবী (রাঃ) এ পত্র বহন করে নেন। হুযূর (সঃ) তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন প্রথমে বসরার গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ গভর্ণর ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। তাঁর মাধ্যমেই পত্র পৌঁছাবার নির্দেশ দেন। যখন কলবী (রাঃ) পত্র নিয়ে বসরার গভর্ণরের নিকট পৌঁছলেন, কায়সার তখন সিরিয়া সফরে ছিলেন। বসরার গভর্ণর দেহ্ইয়া কলবী (রাঃ)-কে সম্রাটের দরবারে পাঠালেন। কায়সারের দরবারে উপস্থিত হলে দরবারের কর্ম-কর্তারা জানালো যে, কায়সারের সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রত্যেকের জন্যে এটা বাধ্যতামূলক যে, কায়সারকে সিজদা করবে। দেহ্ইয়া (রাঃ) সিজদা করতে অস্বীকার করে বল্লেন, 'আমরা মুসলমান, আমরা কোন মানুষকে সিজদা করি না।" সুতরাং সিজদা না করেই তিনি কায়সারের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে হুযূর (সঃ)-এর পত্র দিলেন। সম্রাট অনুবাদকারী দ্বারা পত্র পাঠ করালেন এবং আদেশ দিলেন, 'কোন আরব কাফেলা এসে থাকলে তাদেরকে দরবারে হাজির করবে, যাতে আমি তাদের কাছ থেকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জানতে পারি। ঘটনাচক্রে আবূ সুফিয়ান সে সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় ছিলেন। দরবারের কর্ম-কর্তারা সুফিয়ানসহ ঐ কাফেলাকে সম্রাটের সামনে হাজির করলেন। সম্রাট হুকুম দিলেন যে, আবূ সুফিয়ানকে সকলের অগ্রভাগে খাড়া করা হোক এবং তার সঙ্গীদেরকে তার পিছনে খাড়া করা হোক। তিনি এই নির্দেশও দিলেন যে, আবূ সুফিয়ান যদি কোন কথা মিথ্যা বলে, তাহলে সঙ্গীরা যেন তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে। অতঃপর সম্রাট আবূ সুফিয়ানকে প্রশ্ন করা শুরু করলেনঃ

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করেছে এবং আমাকে পত্র পাঠিয়েছে তাকে কি তুমি জান ? তুমি বলতে পার তার বংশ কেমন?

উত্তর ঃ সে একটি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। সে আমার পিতৃব্যপুত্র।

প্রশ্ন ঃ ইতঃপূর্বে এই রকম দাবী আর কেউ করেছিল ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তার দাবীর পূর্বে তোমরা কি কখনও তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার কোন অভিযোগ উত্থাপন করেছিলে ?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ রাজা বাদশাহ্ ছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ তার বুদ্ধি-বিবেচনা কেমন, তার বিচার-ক্ষমতা কেমন ?

উত্তর ঃ আমরা তার বুদ্ধি-বিবেচনায় এবং তার বিচার-ক্ষমতায় কখনও কোন ত্রুটি দেখি নি।

প্রশ্ন ঃ তার অনুসারীগণের অধিকাংশ বড় লোক, না গরীব ?

উত্তর ঃ গরীবই বেশী।

প্রশ্ন ঃ তার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না হ্রাস পাচ্ছে ?

উত্তর ঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ এই ব্যক্তি কি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ?

উত্তর ঃ এখন পর্যন্ত করে নি। সম্প্রতি আমাদের সাথে একটি নতুন সন্ধি হয়েছে। তা রক্ষা করেন অথবা ভঙ্গ করেন তা আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি।

প্রশ্ন ঃ তোমাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে কি ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ ফলাফল কী ?

উত্তর ঃ কখনও আমরা জিতেছি, কখনও তিনি।

প্রশ্ন ঃ তিনি কী শিক্ষা দেন ?

উত্তর ঃ তিনি শিক্ষা দেন 'এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাকেও শরীক করো না। নামায পড়, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র হও। দরিদ্রদের দান কর। প্রতিজ্ঞা পালন কর, আমানত খিয়ানত করো না।'

এ কথোপকথনের পর কায়সার দোভাষীর মাধ্যমে বলেন, 'তোমরা তাঁকে সদ্বংশজাত বল্লে, পয়গম্বর চিরদিনই সদ্বংশজাত হয়ে থাকেন। তোমরা বলেছ, তাঁর বংশে অন্য কেউ নবী দাবী করে নি। যদি করে থাকতো, তবে মনে করতাম ইহা বংশগত ভাবধারার প্রতিক্রিয়া। তোমরা বলেছ যে, এ বংশে কেউ কখনও রাজা ছিলেন না। থাকলে মনে করতুম, তিনি রাজত্বের লোভে এরূপ করছেন। তোমরা বলেছ, জীবনে তিনি মিথ্যা বলেন নি। যিনি মানুষের সাথে মিথ্যা বলেন না, তাঁর পক্ষে আল্লাহ্র সম্পর্কে মিথ্যা বলা সম্ভব হতে পারে না। তোমরা বল্লে, গরীবরাই অধিক সংখ্যায় তাঁর অনুসারী হচ্ছে। নবীদের প্রথম অনুসারীরা প্রায়ই দরিদ্র লোক হয়ে থাকে। তোমরা স্বীকার করলে যে, তাদের ধর্ম ক্রমে প্রসার লাভ করছে। সত্য ধর্ম এভাবেই প্রসার লাভ করে। তোমরা বলেছ, তিনি কখনও প্রবঞ্চনা করেন নি। নবী কখনও প্রবঞ্চনা করতে পারেন না। তোমরা বল্লে, নামায, সচ্চরিত্রতা ও সংযম সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়ে থাকেন। যদি উহা সত্য হয়, তবে তিনিই সেই নবী।'

এরপর দরবারে হুযূর (সঃ)-এর পত্র পড়া হলে ধর্মযাজকগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মহাহুলস্থুল আরম্ভ করে। এসব গুরুত্বপূর্ণ কথা তাদের মৃত বিবেকে কোন রেখাপাত করতে পারে নি। তাদের কথা হলো, কী এত বড় স্পর্ধা!

একজন আরব রোম সম্রাট ও তাঁর প্রজা সাধারণকে খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানায় এবং এই অপমান সহ্য করতে হবে ? সম্রাট এ অবস্থায় দূত, আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের দরবার ত্যাগ করতে বলেন।

পারস্য সম্রাট খসরুর দরবারে

খসরুর দরবারের চেহারা ছিল ভিন্ন রূপ। আঁ হযরত (সঃ)-এর পত্র পাঠ করে সম্রাট বেজায় চটে গেলেন। ক্রোধান্ধ ও অহংকারী সম্রাট পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে এবং এই নবুওয়তের দাবীদারকে গ্রেফতার করে আনতে ইয়ামেনের শাসনকর্তা বাজানের প্রতি আদেশ জারী করে।

বাজান হযরত (সঃ)-কে আনার জন্যে দু'জন দূত পাঠান। তারা এসে হযরত (সঃ)-কে জানালেন যে, পারশ্য সম্রাট তাঁকে তলব করেছেন। হুযূর (সঃ) পরদিন তাদেরকে জানালেন যে, ইতঃমধ্যে সম্রাট খসরু তাঁর পুত্র কর্তৃক নিহত হয়েছে। দূতদ্বয় রাজার নিকট ফিরে গেলো। তাঁর পুত্র নতুন সম্রাট হুযূর (সঃ)-কে গ্রেফতার স্থগিত রাখতে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র কি মহিমা এরপর বাজান ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে ইসলাম আরবের বাইরে পা বাড়ালো।

বাহরায়েন ও ওমানের শাসনকর্তাগণ আঁ হযরত (সঃ)-এর পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের পৌত্তলিক প্রজারাও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু বাহরায়েনের ইহুদী ও খৃষ্টান প্রজারা ইসলাম গ্রহণ অস্বীকৃতি জানালো। তাদেরকে তাদের নিজেদের ধর্ম পালনের অধিকার দেয়া হলো। তাদেরকে শুধু রাজ-কর 'জিযিয়া' আদায় করতে হতো।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট লিখিত পত্রটি হলো (বাংলা তর্জমা) ঃ

এই পত্র আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল-এর পক্ষ থেকে রোমানদের প্রধান হিরাক্লিয়াসের নিকটে লিখিত হলো। যে ব্যক্তি খোদাতাআলার হেদায়াত অনুসরণ করে তার উপর খোদাতাআলার সালাম বর্ষিত হোক, অতঃপর,- 'হে বাদশাহ্ ! আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি (অর্থাৎ দাওয়াত দিচ্ছি, এক খোদা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনার জন্যে)।

'হে সম্রাট মুসলমান হয়ে যান তা হলে খোদা আপনাকে সকল প্রকারের ফেৎনা থেকে বাঁচাবেন এবং আপনাকে ডবল পুরস্কার দিবেন [অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনার জন্যে পুরস্কার দিবেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপরে ঈমান আনার জন্যেও পুরস্কার দিবেন)। কিন্তু আপনি যদি এই কথা মানতে অস্বীকার করেন, তাহলে কেবল আপনার নিজের পাপটি আপনার উপরে বর্তাবে না, বরং আপনার নিজের পাপটি আপনার প্রজাদের ঈমান না আনার পাপও আপনার উপরে বর্তাবে।' পত্রের শেষে কুরআন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত ছিল। যার অর্থ হলো ঃ 'হে আহলে কিতাব ! এসো এই কথার উপরে আমরা একত্র হয়ে যাই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন অর্থাৎ আমরা সবাই খোদাতাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করবো না এবং কোন কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কোন মানুষকেই এত বেশী মর্যাদা দিব না যাতে তাঁকে খোদায়ী গুণের পূর্ণ অধিকারী বলে মনে হবে। আহলে কিতাব যদি ঐক্যের এই দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে, 'হে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীরা ! তোমরা ওদেরকে বলে দাও যে, আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণকারী।'

'কোন কোন ইতিহাসে লিখা আছে যে,যখন এই পত্রখানি সম্রাটের সামনে পেশ করা হয়েছিল, তখন দরবারের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, এই পত্রাটিকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। কেননা, এতে সম্রাটকে অপদস্থ করা হয়েছে ; এবং পত্রের উপরে রোমান সম্রাট লেখা হয় নি। বরং লেখা হয়েছে, 'সাহেব-এ-রোম' রোমের অভিভাবক। কিন্তু বাদশাহ্ বলেছিলেন, এটা নির্বুদ্ধিতার কথা যে, পত্র পাঠ করার পূর্বেই তা ছিঁড়ে ফেলতে হবে এবং আমাকে যে লেখা হয়েছে রোমের অভিভাবক, তা ঠিকই আছে। আসল মালিক তো আল্লাহ্। আমি তো মাত্র অভিভাবকই। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি বল্‌লেন যে, রোমান সম্রাট যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, সেজন্যে তাঁর রাজত্ব বেঁচে যাবে এবং তাঁর সন্তানেরা বহুদিন যাবৎ রাজত্ব চালিয়ে যাবে। বস্তুতঃ হয়েছিলও তাই' [*নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)*]

হুযূর (সঃ)-এর এসব চিঠি একই রূপ ছিল না। তবে বিভিন্নতার মাঝেও মূল সুরটি ছিলো একই। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ্‌দের কাছে কুরআনের ইসলামকে তুলে ধরা এবং একই সাথে তাঁদের প্রজাদেরসহ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান। এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করার আছে। তিনি যে বিশ্ব-নবী ছিলেন তা কিতাবে আবদ্ধ না রেখে তখনকার পরিবেশে তিনি বিভিন্ন দেশে প্রচারের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। লেখা যে প্রচারের অতীব শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে এবং তা যে সত্যের প্রচারে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে এরও তিনি ভিত্তি স্থাপন করে যান প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই মাধ্যমটি শুধু অমুসলিম দেশেই নয় মুসলিম প্রধান দেশগুলোতেও ব্যাপকভাবে অসত্য ও অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারের কাজে লাগানো হচ্ছে। এ যেন অবক্ষয়কে দাওয়াত দিয়ে গৃহে আনা। (চলবে)

-- **মোহাম্মদ মোস্তফা আলী**

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

ইংরেজদের এজেন্ট !

সংকলন - বুরহান আহমদ যাফর দুররানী

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐশী জামাতসমূহের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। কিন্তু শয়তান প্রত্যেক মোকাবেলার ক্ষেত্রে নিজের কৌশল বদলিয়ে ফেলে। জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসের পুরো শতবর্ষ পরে মোল্লাদের পরিত্যক্ত কড়াইতে পুনরায় বলক এসেছে এবং পুরনো কথাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে অভ্যন্তরীণ নোংরামীর পূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করছে। জামাতে আহমদীয়া ও এর প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে মোল্লা গত শত বর্ষ ধরে এ অভিযোগ উত্থাপিত করে আসছে যে, জামাতে আহমদীয়া ইংরেজ কর্তৃক রোপিত চারা গাছ। কিন্তু এবার এ অভিযোগের সাথে সাথে একটি নতুন কথা এই সংযোজিত হয়েছে যে, আহমদী জামাত ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলো। কিন্তু এর কোন দলীল না দিয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গোলযোগের উদ্ধৃতি দেয় আর সাথে সাথে বলে যে, হযরত মির্যা সাহেব ইংরেজদের বহুল প্রশংসা করেছেন এবং দলীল এর এই বের করেছেন – যেহেতু অনেক প্রশংসা করেছেন তাই ইহা প্রমাণিত হয় যে, জামাতে আহমদীয়া ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলো। বাহ্ মোল্লা বাহ্ ! তোমার এই বিকৃত বুদ্ধির জন্যে কুরবানী হয়ে যেতে মন চাইছে ! জামাতে আহমদীয়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো ১৮৮৯ সনে এবং সমর্থনের উদ্ধৃতি দেয়া হয় ১৮৫৭ সনের ; যখন কিনা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং তাদের বুযর্গরা ইংরেজদের সাহায্য ও সমর্থনের ডাক দিয়েছিলো এবং ১৮৫৭ সনে ইংরেজদের বিরোধিতাকারীদের বিদ্রোহী, দৃষ্কৃতকারী ও জারয সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছিলো।

আজ জামাতে আহমদীয়ার মোকাবেলায় সকল ফির্কাকে ঐক্যবদ্ধ দেখা যাচ্ছে। আহলে হাদীসের লোকেরা খুবই জোরে-শোরে দেওবন্দীদের সমর্থন দিয়ে আহমদী জামাতকে ইংরেজদের সহায়তাকারী হিসেবে চিহ্নিত করছে। তারা কি কখনও তাদের হাঁড়ির খবর নিয়েছেন ? যদি নিয়ে না থাকেন তাহলে আমরা সে খবর দিতে চাইবো।

মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালভী সাহেব, আহলে হাদীসের প্রবক্তা তার ইশায়াতে সুন্নাহ্ নামক পত্রিকায় লেখেন ঃ

"১৮৫৭ সনের দাঙ্গায় যেসব মুসলমান যোগদান করেছিলেন তারা ঘোরতর পাপী এবং কুরআন হাদীসের আদেশানুযায়ী তারা বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতকারী ছিলো" (ইশায়াতে সুন্নাহ্ ৯ম-১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৮)।

এখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালভী সাহেবের প্রশংসার কথাও পাঠ করুন ঃ

"তুরস্কের সুলতান একজন ইসলামী বাদশাহ্ কিন্তু সাধারণ নিরাপত্তা ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও আমাদের মুসলমানদের জন্যে কোন কম গর্বের কারণ নয়। আর বিশেষ করে আহলে হাদীসের জন্যে তো এ শাসন নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার দিক থেকে বর্তমানকালের সকল ইসলামী শাসন (তুর্কী, ইরান, খোরাসান) থেকে আরও গর্বের বিষয়" (ইশায়াতে সুন্নাহ্ পত্রিকার খন্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৯১-২৯৩)।

হযরত মির্যা সাহেব ১৮৫৭ সনের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে যদি বিদ্রোহ লিখে থাকেন তখন বড়ই অন্যায় হয়। মোল্লা অলি-গলিতে চিৎকার করে আর মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালভী, আহলে হাদীসের আলেম যখন 'দাঙ্গা' লিখেন তখন কোন আপত্তি হয় না। এতে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিদ্রোহী, দুষ্কৃতকারী পাপী লিখেন তখনও কোন দোষ নেই অথচ অভিযোগ কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'বিদ্রোহ' লিখলে।

১৮৫৭ সনের উদ্ধৃতিতে আহমদী জামাতকেই ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলেন এমন লোকেরা ঐ আহলে হাদীস আলেমকে, যিনি শামসুল উলামা মাওলানা নাযীর আহমদ দেহলভী নামে খ্যাত, এ উদ্ধৃতি পাঠ করে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলবেন না বিশ্বাসঘাতক। তিনি লিখেন ঃ

"সারা হিন্দুস্থানের নিরাপত্তা এর মধ্যে আছে যে, কোন অপরিচিত বিচারক এর ওপরে নিয়ন্ত্রক হোন তিনি হিন্দু হবেন না বা মুসলমান বরং ইউরোপের কোন শাসক হবেন। কিন্তু খোদার অশেষ দয়া তাঁর ইচ্ছা হলো যে, ইংরেজ শাসক হোক" (মজমুয়া লেকচারস্, মাওলানা নাযীর হোসেন দেহেলভী, পৃষ্ঠা ৪-৫, ছাপা ১৮৯০)।

পুনরায় লেখেন ঃ

"সরকার কি অত্যাচারী না কঠোর, তওবা পিতা-মাতার চেয়েও স্নেহশীল" (মজমুয়া লেকচারস্ মাওলানা নাযীর হোসেন দেহেলভী, পৃষ্ঠা ১৯, ছাপা ১৮৯০ সন)।

হে আহলে হাদীস মৌলভীগণ ! নিজেদের ঘরের খবর নাও পরে অন্যের দিকে দৃষ্টি দাও। আমরা কি তোমাদের ইহা বলবো না; তোমরা হিন্দুস্থানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলে না, মুসলমানদের প্রতিও ছিলে না, আর ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার পক্ষেও ছিলে না। আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার জন্যে যে কথাকে দলীল হিসেবে তোমরা উপস্থাপন করেছো ঐ কথাই তোমাদের ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে।

দেওবন্দী তো দুধের ধোয়া! মিথ্যে কথা বলা শিখবে তো এই দেওবন্দী ও নদভী উলামা থেকে শিখো! বরে বারে তারা লিখছেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানীকে ইংরেজেরা দন্ডায়মান করেছে এবং তাদের প্রশংসায় হাজার হাজার পুস্তক রচনা করেছে এবং আর্থিক সাহায্য করেছে এবং বরাত দেয় যে, হযরত মির্যা সাহেবের পিতা ও তাঁর ভাইদের সরকারের পক্ষ থেকে সাতশ' টাকা পেনশন লাভ হতো। কেনই বা লাভ হতো এর কোন উল্লেখ নেই। তাই দেওবন্দীগণ ! যেখানে ইহা লেখা আছে যে, পেনশন লাভ হতো সেখানে ইহাও লেখা আছে যে, ইংরেজ তাঁর সকল জায়গীর দখল করে নিয়েছিলো এবং ঐ জায়গীর দখল করে নেয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেনশন লাভ হতো।

আবার দ্বিতীয় কথা এই যে, এ পেনশনের সাথে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও আহমদী জামাতের কী সম্পর্ক ? জামাত তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। আর সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর (আঃ) পিতার মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ঈমানদারী তো ইহা হ'ত যে, যদি এই দেওবন্দী একথা প্রমাণ করতো যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব সরকারের

পক্ষ থেকে পেনশন পেতেন অথবা আহমদী জামাত প্রতিষ্ঠার খাতিরে টাকা-পয়সা সাহায্য করতেন। অথচ এমন কোন সাক্ষ্য নেই। কেননা, কোথাকার কড়া কোথায় লাগিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

আফসোস তো এ কথার যে, এরা নিজেদের হাঁড়ির খবর সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও তাদের ঈমানের আত্মাভিমান তাদেরকে ইহা অনুমতি দেয় না যে, সত্যি কথা বলে দাও। কেননা, এরা আসলে মিথ্যাবাদী। বেশতো আমরা আপনাদের হাঁড়ির খবর শুনাচ্ছি। লেখা আছে ঃ

"মুসলমান . . . এ মুহূর্তের জন্যেও এমন সরকারের বিরুদ্ধে অন্যায় সন্দেহের ধারণাই করতে পারে না। . . . যদি কোন দুর্ভাগা মুসলমান সরকারের অবাধ্যতা করার সাহস দেখায় তাহলে আমরা ঢাক পিটিয়ে বলছি যে, সে মুসলমান মুসলমানই নয়" (আখবার যমীনদার, লাহোর, ১১ই নভেম্বর, ১৯১১ সন)।

এভাবে আরও লেখে ঃ

"নিজ বাদশাহে আলম পানাহ্‌র কপালের এক ফোঁটা ঘাম ব্যতিরেকে নিজ দেহের রক্ত প্রবাহিত করার জন্যে প্রস্তুত। আর হিন্দুস্থানে সব মুসলমানের এই-ই অবস্থা" (আখবার যমীনদার, লাহোর, ২৩শে নভেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দ)।

বিশ্বস্ত ব্রিটেন সরকার সম্বন্ধে দেওবন্দী ও নদভী কী লিখছে !

"এর (নদওয়াতুল উলামা) আসল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ধারণা সম্বলিত আলেম সৃষ্টি করা এবং এ ধরনের আলেমদের অবশ্য কর্তব্য ইহাও যে, সরকারের শাসনের কল্যাণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আর দেশে সরকারের বিশ্বস্ততার ধারণা প্রসারিত করা" (আন্ নদওয়া, জুলাই, ১৯০৮, ৫ম খন্ড)।

সুতরাং এ সংগঠনের এমনই সুস্পষ্ট ধারণা সম্বলিত উলামা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিলো যা কিনা ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বস্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে থাকে। পরিশেষে কেনই বা এ প্রচেষ্টা ? এজন্যে যে, এর ভিত্তিই রেখেছিলো ইংরেজ। এ বর্ণনা যদি অন্য কেউ দেয় তাহলে আপত্তি হতে পারে যে, জ্বলন ও হিংসায় বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে বিষয় তা নয়। স্বয়ং তাদের পত্রিকা আন্ নদওয়া লেখে যে,

"১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা-এর ভিত্তি যুক্ত প্রদেশের হিজ অনার লেফটেনেন্ট গভর্নর বাহাদুর স্যার জন হুট হিউস, কে সি. এস, আই-ই রাখেন" (আন্ নদওয়া, ডিসেম্বর ১৯০৮, পৃষ্ঠা-৪)।

আরও লেখে যে,

"যদিও এ প্রখ্যাত ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ একজন ইংরেজের অবদান" (আন্ নদওয়া, ডিসেম্বর, ১৯০৮, পৃষ্ঠা-৪)

এ নদওয়াপন্থীরা বলুক যে, আহমদীয়া জামাতের কোন্ বিদ্যাপীঠের ভিত্তি ইংরেজ রেখেছিলো ? হে ইংরেজদের পুতুল! দেওবন্দ সম্বন্ধে পাঠ করো। লেখা আছে ঃ

"থানাভুনে মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব এবং পাঞ্জাবে মৌলভী হুসায়েন আলী এ ব্রিটিশ শাসনের সোল এজেন্ট ছিলো। এমন কি যে, থানভী সাহেবকে ইংরেজ সরকার থেকে ধন-সম্পদের একটি বিশেষ 'ডবল ওযীফা' (ভাতা) নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিলো। (দেখো মুকালামাতুস্ সদরাঈন মৌলভী শাব্বীর আহমদ উসমানী দেওবন্দী, পৃষ্ঠা-৯)।

বেশতো দেওবন্দীদের পাঁচ আঙ্গুলে ঘি' হয়ে গেলো। একদিকে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ইংরেজদের টাকায় সৃষ্টি হলো (মুকালামাহ্ পৃষ্ঠা-৭)। অন্যদিকে তবলীগী জামাত এ সাহসী পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হলো (মুকালামাহ্, পৃষ্ঠা-৮) আরো তারই নির্দেশে কংগ্রেসেরও বিকাশ লাভ ঘটলো (মুকালামাহ্, পৃষ্ঠা-৯)। মোটকথা এসব রাজনৈতিক চালের নামের ওপরে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে নেয়া হলো এবং কোন্ মুসলমান অবহিত নয় যে, দেওবন্দী যে দলেরই নেতৃত্ব দিয়েছে সর্বদা মুসলমানদের বিনাশের দৃশ্যাবলীই তাদের সম্মুখে ছিলো (দেওবন্দী মযহাব, প্রণেতা মুনাযেরে ইসলাম হযরত মাওলানা গোলাম মেহের আলী সাহেব, প্রকাশক হামিদিয়া লাইব্রেরী, গঞ্জ বখশ রোড, লাহোর, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯)।

এভাবে একস্থানে লেখা আছে ঃ

"দেখুন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহে আলায়হে স্বীকৃত বুযর্গ নেতা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কতক লোককে ইহা বলতে শুনা গেছে যে, সরকারের পক্ষ থকে তাঁকে মাসিক ৬০০ টাকা করে দেয়া হচ্ছিলো" (মুকালামাতুস সদরাইন শাব্বীর আহমদ উসমানী, পৃষ্ঠা-৯)।

চিন্তা করুন ! কে ক্রয় করা এজেন্ট ছিলো। আহমদী জামাতের ওপরে অভিযোগকারী দেওবন্দী স্বীয় আলেমগণের ব্যাপারে কী ফতওয়া দিবেন যাদের ক্রয় করা ও ব্রিটিশ সরকারের বিশস্ততা ও তাদের বিনিময়ের মাধ্যমে এজেন্ট লাভ প্রমাণিত!

সম্মিলিত উলামা পরিষদ যা কিনা এসব দেওবন্দী, ওহাবী নদভী, আহলে হাদীস সকলের সম্মিলিত ঐক্য আর আজকাল পত্রিকায় বিবৃতি প্রদানে অগ্রগণ্য। পরিশেষে তাদের ভিত্তি কে রেখেছে এবং কার সেবাদাস বলা যেতে পারে ? আসল কথা এই যে, যে সাহায্যকারী হবে জমঈয়ত তাদের গুণ-গান করবে এবং তাদের প্রতি বিশস্ততা রক্ষা করবে। জমঈয়তুল উলামা (সম্মিলিত উলামা পরিষদ) সম্বন্ধে লেখা আছে ঃ

"জমঈয়তে উলামায়ে ইসলাম কোলকাতায় সরকারী অর্থ সাহায্যে ও উহার পৃষ্ঠ-পোষকতায় সৃষ্টি হয়েছে . . . . আলাপ আলোচনান্তে নির্ধারিত হয়েছে যে, সরকার এদের (দেওবন্দীদের) যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ এ উদ্দেশ্যে দেবে। সুতরাং বড় রকমের একটি তহবিল এজন্যে অনুমোদন করে নেয়া হয়েছে এবং এর এক কিস্তি মাওলানা আযাদ সুবহানী সাহেবের হাওলা করেও দেয়া হয়েছে। এ অর্থ দ্বারা কোলকাতায় কাজও শুরু করে দেয়া হয়েছে" (মুকালামাতুস্ সদরাইন শাব্বীর আহমদ উসমানী, পৃষ্ঠা-৭, 'দরজাহ্ বালা দেওবন্দী মযহাব' পুস্তকের ৩৫৮ পৃষ্ঠার বরাতে)।

ওহাবীরা বা পিছনে থাকবে কোন্ দুঃখে। তাদের ব্যাপারেও পাঠ করুন। লেখা আছে যে, **"ইংরেজরা বড়ই সাবধানতা ও ধূর্ততার সাথে হিন্দুস্থানে 'তাহরীকে তাহাদ্দীস' এর চারা রোপণ করেছে আবার উহাকে তাদের হাতেই লালন-পালন করেছে"** (তূফান, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৬ সন)।

এভাবে অপর এক স্থানে লেখা আছে ঃ

"কিন্তু মাহাত্ম্য এখন আর ঢেকে রাখা যায় নি যে, 'ওহাবী তাহরীক' -ও হিন্দুস্থানে ইংরেজদের দুধ পান করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তাদের রাজনৈতিক সমর্থন নৈতিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেই এই জামাত জেহাদের তামাশা রচনা করতে

পেরেছে এবং হিন্দুস্থানের মুসলমানদের এই সম্মিলিত শক্তিকে যেভাবে মাওলানা ফযলুল হক আলায়হের রহমত ও তাঁর সহকর্মীরা ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করছিলো, জেহাদের নামে উহার দিক আফগানী মুসলমানদের দিকে ফিরানো গিয়েছিলো" (তবলীগী জামাআত হাকায়েক ও মা'লুমাতকে উজালে মে, পৃষ্ঠা-১০)।

বেরেলভীগণ মনে করে থাকবেন যে, আমরা বেঁচে গেছি। যদিও এসব লোক ব্রিটিশ সরকারের তোষামুদে ছিলো। আর হিন্দুস্থানকে 'দারুল হরব নয় বরং দারুস্ সালাম', মনে করতেছিলো। লেখা আছে যে,

"ইংরেজদের উলীল আমর বা আদেশ দেবার অধিকারী বলে ঘোষণা দেয় এবং ফতোয়া দেয় যে, হিন্দুস্থান দারুস্ সালাম। ইংরেজদের রোপিত চারাগাছ কিছু দিনের মধ্যে একটি ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ নেয়" (চাটান, লাহোর, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৩ সন)।

এভাবে লেখা আছে ঃ

"কিন্তু বেরেলভী চিন্তাশীল লেখকদের নেতা ও মুজাদ্দিদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ আন্দোলনের প্রভাব ও ফলাফলসমূহের অনুমান করতে গিয়ে ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বের প্রমাণ দেয়। আর খেলাফত আন্দোলনের ক্ষতি করার লক্ষ্যে 'দাওয়ামুল-আয়েস' নামক একটি পুস্তিকা-সংকলন করে। এতে তারা ব্যাখ্যা করে যে, যেহেতু শরীয়তী খেলাফতের জন্যে কুরায়েশী হওয়া আবশ্যকীয় (উদ্ধৃতি সংযোজিত হলো) -

"এজন্যে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের তুর্কীদের সাহায্যের কোন দরকারই নেই। কেননা, তারা কুরায়েশী নয়। এর ভিত্তিতে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই আন্দোলনের সর্বৈব বিরোধিতা করে আর ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করার সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়" (বেরেলভী তারিখ ও আকায়েদ, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০)।

আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে যেসব ফিরকা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে এমন কোন ফিরকা নেই যারা ইংরেজদের প্রশংসা করে নি এবং ব্রিটেন সরকারের কাছ থেকে চাঁদা বাজি করে নি। নিজেদের কুকীর্তি গোপন করার জন্যে আক্রমণ চালানো হয় আহমদী জামাতের ওপরে। কিন্তু এ সত্যকে কখনও লুকানো যেতে পারে না।

যখন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হলো তখন আহমদী জামাত এতে পুরোপুরিভাবে অংশ নিলো। এ সত্য কারও অজানা নেই যে, চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ যাফরউল্লাহ্ খান সাহেব আহমদী ৩টি গোল টেবিল বৈঠকেই যোগদান করে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পত্র-পত্রিকাদিতে এবং চৌধুরী সাহেবের আত্ম-জীবনী 'তাহ্দীসে নি'মাত' পুস্তকে রয়েছে। আসল কথা তো এই যে, চৌধুরী সাহেবই ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আহমদী জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণের পরে স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজদের সাথে সর্বপ্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঁর প্রসঙ্গে 'ইনকিলাব' পত্রিকা লেখে ঃ

"গোল টেবিল বৈঠককে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো উহার সমাধান কল্পে মূল্যবান ও ফলদায়ক সেবা স্যার মুহাম্মদ যাফর উল্লাহ্ খান উপস্থাপন করেছিলেন" (আখবার ইনকিলাব, ১৩ই জুলাই, ১৯৪১ সন)।

'বিয়াসত" পত্রিকা লেখে ঃ

"ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ যাফরউল্লাহ্ খান একজন উন্নত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্যে ইহা সম্ভব নয় যে, তাঁর ভিতর ও বাইর এক না হয়। হায় ! ব্রিটেনের মন্ত্রীরা যদি স্যার মুহাম্মদ যাফর উল্লাহ্র এ বিবৃতিকে চোখ খুলে পড়ে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হয়" (রিয়াসত, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ সন)।

"দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সময়ে যখন গান্ধিজীকে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করে তখন মাওলানা শাফী দাওদী সাহেব উহার ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। আহমদী জামাতের ইমাম হযরত মির্যা বশীরদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব ১২ জানুয়ারী, ১৯৪৫ তারিখে কাদিয়ানের মসজিদে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা দেন। এতে তিনি প্রত্যেক আহমদীকে এ আহ্বান জানান যে, তারা যেন গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরে ফিরে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ডাক সমুন্নত করে" (আল্ ফযল, কাদিয়ান, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৫ সন)।

আহমদী জামাত জেহাদের অস্বীকারকারী নয়। অবশ্যই জেহাদ সম্বন্ধে অচল দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বীকারকারী যা কিনা সন্ত্রাস ও ফিরকা পূজা মোল্লা উপস্থাপন করে। আহমদী জামাতের নিকট যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে ও ধর্মকে মিটানের জন্যে তরবারী না উঠানো হয় সেখানে তরবারীর জেহাদ অবশ্যই জায়েয নয়। আর বর্তমান যুগে বিশেষ করে এর কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। অবশ্যই কলমের জেহাদ প্রবহমান রয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কলমের জবাব কলম দ্বারা দেয়াই হলো জেহাদ। আহমদী জামাত ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সর্বদা এ বৈশিষ্ট্য সমুন্নত করে এসেছে যে, তারা যে দেশে অবস্থান করে, যে দেশে বসবাস করে উহার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে বসবাস করে। সুতরাং কোন দেশেই এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না যে, কোন আহমদী নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হিন্দুস্থানের বিশ্বস্ত ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক। (তেমনিভাবে বাংলাদেশের আহমদীগণ সর্বদা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যশীল, বিশ্বস্ত ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক-অনুবাদক)।

পাঠক ! এ শেষ যুগে সবচে' বড় বিপর্যয় উলামাদের পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিলো। তাদের প্রত্যেক কথার ভিত্তি মিথ্যার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার ছিলো। এ প্রচার পত্রে কেবল এসব আলেমদের মিথ্যা আর মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করা হয়েছে। খোদাতাআলা এসব মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজদের কবল থেকে সকলকে রক্ষা করুন!

(প্রচারপত্র, কাদিয়ানের নেযারতে নশর ও ইশায়াত থেকে প্রচারিত)।

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

"আশা করি আগামী শতাব্দীর শেষ নাগাদ দীনে ইসলাম সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে"।

– হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

(ইন্টারন্যাশনাল তবলীগী, সেমিনার, ২৯.৭.৯৯ইং)

মুকাদ্দস বিরসাহ্

(পবিত্র উত্তরাধিকার)

মিসেস বুশরা দাউদ

একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক

(২য় কিস্তি)

এখন দেখো ! খোদাতাআলা এসব কিছু কীভাবে করে থাকেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে খোদার ঘরের হেফাযতের জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও এ ঘরের হেফাযত করতে আনন্দ পেতেন। তাঁর (আঃ) খাবার ও পান করবার কোন চিন্তা ছিলো না। যদিও মক্কা ছিলো ধূসর মরুভূমি। কখনও কখনও সেখানে শিকারও পাওয়া যেতো না। তরি-তরকারী সেখানে উৎপন্নই হোত না। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ) কখনও চিন্তা করেন নি যে, আমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবো যেখানে খাবার ও পানীয় অনায়াসে পাওয়া যাবে। তিনি কখনও তাঁর ক্ষুধার চিন্তা করেন নি। এ দিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপই ছিলো না।

কিন্তু খোদা কী করলেন। তিনি তাঁকে মক্কার বাদশাহ্ বানিয়ে দিলেন। উহা এভাবে যে, যমযম প্রস্রবণের মালিক ছিলেন তিনি। খোদার ঘরের দায়িত্বও তাঁর ওপরে ন্যস্ত ছিলো। আর যখন কাফেলা পানির জন্যে আসতো। হজ্জের জন্যে আসতো। কা'বার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতো তখন খুশী ও ভালবাসার সাথে এবং বিশ্বাসের সাথে হযরত ইসমাঈলকে দূর দূর এলাকা থেকে ফল-ফলাদি ও তরি-তরকারী উপহার হিসেবে দিতো আর ওগুলো গ্রহণ করার ফলে গৌরব করতো।

তাই শিশুরা দেখো ! যে ব্যক্তি খোদার সেবায় নিয়োজিত হয় তখন খোদা দুনিয়াকে তার সেবায় নিয়োজিত করে দেন। এ ব্যবহার কেবল হযরত ইসমাঈলের সঙ্গেই হয় নি বরং তাঁর সন্তান-সন্ততিও পার্থিব কল্যাণ লাভ করেন।

আবার তাঁর সন্তান-সন্ততি উন্নতি করতে করতে বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়লো। কতিপয় গোত্রে বিভক্ত হলো। আরবের গোটা এলাকায় তাঁর সন্তানাদি মজুদ ছিলো। আর এ সকল গোত্রই কা'বা ঘরের অশেষ সম্মান করতো। ইহাকে ভালবাসতো এবং এর হেফাযতের জন্যে নিজেদের সব কিছু কুরবানী করার জন্যে ভয় পেতো না।

এ ভালবাসা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে হ্রাস পায় নি, বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেভাবে আপনারা অবহিত আছেন যে, খোদা তাঁর সবচে' প্রিয় বান্দাকে মক্কায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাই খোদাতাআলা এই শাহযাদার খাতিরে প্রথম থেকে সেখানে এমন সব লোকদের একত্রিত করা আরম্ভ করে দিয়ে দিলেন যাঁরা তাকে স্বাগত জানাতে পারেন।

তোমরা দেখে থাকবে যে, যখনই কোন বড় লোক আসার সময় হয় তখন লোকেরা তাকে স্বাগতম আগে থেকেই জানাতে পারে, তারা অপেক্ষা করতে থাকে যে কখন সংবাদ আসে। কতক ঐ সময়ে, জানতে পেরে সমবেত হতে থাকে আবার কতককে আগমনকারী সম্বন্ধে বারে বারে ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

অবিকল এভাবেই কতক লোক নিজেদের পিতা পিতামহের নিকট থেকে শুনে আসছিলো যে, এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন। বাকী বিশ্বের লোকদের প্রত্যেক যুগে আগমনকারী নবী বলে গেছেন যে, হে আমার উম্মতের লোকেরা, আমাকে মান্যকারীরা! শুন, এমন একজন মহান ও পবিত্র ব্যক্তি আসছেন ও তাঁর নিদর্শনাবলীও বর্ণনা করেন।

যেসব লোক এ ঘোষণা থেকে বঞ্চিত ছিলো তারাও যথাসময়ে অবহিত হয়ে যায়। এসব লোকদের জন্যে খোদা এমন এক ব্যবস্থা করেছেন যে, তাঁর শক্তি ও মহিমা দেখে বুদ্ধি তাক্ লেগে যায়।

ইহা অন্য একটি ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আঠাশ শ' বছর পরে মক্কায় সংঘটিত হয়।

খোদাতাআলা করলেন কী ? হযরত আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাদা। যখন তাঁকে আল্লাহ্তাআলা যমযমের কূয়ো সম্বন্ধে বল্লেন, তখন তিনি তাঁর কুরাইশ গোত্রের লোকদের নিকট সাহায্য চাইলেন এই বলে যে, আস ! আমরা সবাই মিলে এ পবিত্র প্রস্রবণের অন্বেষণ করি। এ প্রস্রবণ অগুণতি সময়ের ধরে বালি ও মাটির নীচে চাপা পড়েছিলো এবং কারও মনে ছিলো না যে, আসলে ইহা কোথায় রয়েছে।

প্রথমে কিছু লোক তো প্রস্তুত হলো। কিন্তু পরে এ কাজকে অসম্ভব মনে করে কেউ রাজী হোল না। হযরত আব্দুল মুত্তালিব তাঁর একমাত্র পুত্র হারেসের সাথে প্রস্রবণের অন্বেষণে বের হলেন। কিছু লোক পিতা-পুত্রকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করলো। হযরত আব্দুল মুত্তালিব ঐ সময় ছিলেন গরীব। আর তাঁর আর কোন পুত্রও ছিলো না। একারণে লোকদের হাসি-ঠাট্টা ও নিজের দুর্বলতার জন্যে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। তিনি খোদার নিকট একটি নযর মানত করলেন।

তোমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগবে যে, মান্ত কাকে বলে ? মান্ত বা নযয়ের অর্থ হলো এই- মানুষ নিজে খোদার সাথে এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে, যদি আমার এ কাজ সম্পাদিত হয়ে যায় বা যা-ই আকাঙ্ক্ষা হোক তা যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আমি খোদার পথে শোকরানা ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অমুক জিনিষ কুরবানী করে দেবো বা এত অর্থ দিয়ে দেবো।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব খোদার সাথে বল্লেন, যদি আমার দশটি পুত্র হয় আর তারা আমার সম্মুখে যুবকে পরিণত হয় তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে আমি তোমার পথে কুরবানী করে দেবো (ইবনে সা'দ, প্রথম খন্ড,আব্দুল মুত্তালিবের নযর প্রসঙ্গে)।

তোমরা হয়ত চিন্তা করছো যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাবীর পূর্বে সারা আরবে তো মূর্তি পূজা হতো। তাহলে পরে খোদার নাম কীভাবে আসলো ? তাই শিশুরা জেনে রাখ ! এমন মূর্খতা ও অন্ধকারের যুগেও এমন ভদ্র স্বভাবের লোক ছিলেন যাঁরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলার সত্তার ওপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও তাঁকেই সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের উৎস হিসেবে মান্যকারী। হযরত আব্দুল মুত্তালিবের প্রসঙ্গে তো বিশেষভাবে কতিপয় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খোদার সত্তার ওপরে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিলো।

এই ঈমানের বদৌলতেই খোদাতাআলা তাঁর সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন এবং তাঁকে যমযম কূপের সন্ধান অবহিত করেন। যেভাবে বলা হয়েছিলো, সে পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে যমযম কূপ পাওয়া গেল। এতে সমাহিত সম্পদও লাভ হলো। এতদ্দ্বারা তাঁর অভাব দূর হয়। আর তিনি কূয়োর মালিকও হলেন।

পরে খোদা তাঁকে দশ পুত্র দিলেন। তারা যৌবনেও পৌছুলেন। তোমরা তো ইহা জানোই যে, কা'বা গৃহ আমাদের প্রভু (সঃ)-এর জন্যে নির্মাণ করা হয়েছিলো। এখন দেখো তাঁর শক্তি ও মহিমাসমূহ কীভাবে এসব কল্যাণসমূহ উহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী পর্যন্ত পৌছানোর ব্যবস্থা করছে।(একটি আশ্চর্য বিষয় ! এ নিয়ে কিছু চিন্তা তো করো যে, খোদা এ মক্কাকে আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্যে

আবাদ করেছেন। তাই এ প্রস্রবণের মালিক তো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই হওয়ার ছিলো। আর খোদার ঘর অর্থাৎ কা'বা ঘরের প্রকৃত উত্তরাধিকার তিনিই ছিলেন)।

তাই শিশুরা বলছিলাম, খোদা প্রথম থেকেই তাঁর দাদাকে সব কিছু দান করেছিলেন। আর আরবের লোকদের বুঝালেন যে, এর প্রকৃত ও যথার্থ উত্তরাধিকারী জন্ম নিতে যাচ্ছেন। এসব কিছুর মালিক তিনিই। এজন্যে এখন থেকেই নিজেদের মেধা-মস্তিষ্ক প্রস্তুত করো যেন সময় আসলে ভুল করে না বসো।

আবার সাথে সাথে খোদাতাআলা আর একবার আঠাশ শ' বছরের পুরাতন ঘটনাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। ইসমাঈল আলায়হেস সালামের সন্তান-সন্ততি তো বহু গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাহলে পরে সেই পবিত্র পরিবার কোন্‌টি যেখানে এই পবিত্র সত্তা জন্ম গ্রহণ করবেন ? তাঁর পিতা কে হবেন ? এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছিলো। এসবের ব্যাপারে খুবই সুস্পষ্টভাবে দেখানো হলো। আর তা এভাবে হলো। যখন সবগুলো পুত্র যৌবনে পদার্পণ করলো তখন হযরত আব্দুল মুত্তালিবের নযর ও মানতের কথা মনে পড়লো। তিনি সব পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে গিয়ে তখন তিনি নিজের ইচ্ছে মত কাউকে তো কুরবানী করতে পারেন না। তিনি তো সেই ছেলেকেই কুরবানী করতে পারেন যাকে খোদা চান ও পসন্দ করেন। এজন্যে হযরত আব্দুল মুত্তালিব সব পুত্রদের নামে লটারী করলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্‌র নাম উঠলো।

তোমরা জানো কি আব্দুল্লাহ্ কে ছিলেন ? ইঁনি ছিলেন আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিতা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লটারীতে যে কোন নাম উঠতে পারতো, কিন্তু আব্দুল্লাহ্‌র নাম উঠলো। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার নিকট আব্দুল্লাহ্ প্রিয় ছিলেন। এর কারণ এই ছিলো যে, আবদুল্লাহ্‌কেই তাঁর প্রিয় ব্যক্তির (সঃ) পিতা হওয়ার ছিলো। তাই লটারীতে অন্য কোন নাম কীভাবে উঠতে পারে ?

হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সবচে' প্রিয় পুত্র তিনিই ছিলেন। যেভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর নিকট ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। এ প্রিয় হওয়ার কতিপয় ব্যাখ্যা হতে পারে। এক তো এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ সবচে' কনিষ্ঠ ছিলেন। আর কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা বেশীই হয়ে থাকে। আবার চেহারা আকৃতিও ছিলো প্রিয়। চরিত্রও ছিলো খুবই উত্তম এবং কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আর কিইবা বলবো ! তিনি সকল সন্তানের মধ্যে সব দিক থেকে সমস্ত উত্তম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। এজন্যেই খোদা তাঁকে নির্বাচিত করেন।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব তাঁর কথায় পাক্কা ছিলেন। অন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করা তো কঠিন। এক পিতা কি করে নিজের সবচে' প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করতে পারে? কিন্তু সবচে' আশ্চর্যের কথাতো এই যে, এক যুবক সন্তান কি করে বিনা বাক্য ব্যয়ে পিতার সাথে যবাই হওয়ার জন্যে যেতে পারে। তার কোন ভয়-ভীতি নেই। জীবনের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কষ্টের অনুভূতিও নেই। তিনি একবারও তাঁর পিতাকে বাধা দেন নি। বরং তৃপ্তিতে ভরপুর ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আব্দুল মুত্তালিবকে ক্ষান্ত হওয়ার ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য তো এই ছিলো না যে, সত্যি সত্যি মানুষকে যবাই করে দেয়া হয়। বরং তাঁর ইচ্ছা তো ছিলো অন্য কিছু শিক্ষা দেয়া। (চলবে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

হিন্দু ধর্ম পরিচিতি ও ইসলামী দৃষ্টিতে হিন্দু ধর্ম

(দ্বিতীয় কিস্তি)

সকল ধর্ম সমন্বয়ের উপলব্ধি দান করতে গিয়ে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বলেনঃ "সকল ধর্ম তা সেগুলির নাম ও মতবাদ যা-ই হোক না কেন, সেগুলো যেখানেই পাওয়া যাক না কেন এবং যে যুগেরই হোক না কেন, সেগুলোর প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ঐশী সত্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। অধিকন্তু যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, মতবাদ ও শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল ধর্ম একটা অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। একই ঐশী কর্তৃত্ব বা অথরিটি যা পৃথিবীর কোন এক এলাকায় এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার বা অন্যান্য যুগের মানুষদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেরও তত্ত্বাবধান করেছে এবং এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমের বাণী।"

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, একই মানব জাতির জন্যে একই উৎস হতে আগত ধর্মের নাম আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যক্ষভাবে আল্ কুরআনে এবং পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে তথা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেও 'ইসলাম' রেখেছেন। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বেদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ ঐশী প্রেরিত এবং তা পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ আল্ কুরআনের আংশিক বিকাশ মাত্র।

হিন্দু ধর্মের সাথে ইসলামের এহেন একাত্মতা উপলব্ধি করে হিন্দুদের অন্তঃকরণে প্রশান্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা এ দাবীর স্বপক্ষে সহজেই সায় দিতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্মের দীর্ঘ দিনের বিকৃত প্রকাশ দৃষ্টে মুসলামানদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রতি যে অনীহা ও অবিশ্বাস ও ঘৃণার সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, উপযুক্ত প্রমাণ লাভে সে সংস্কারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এ দাবীর অনুকূলে সাড়া দিবে না।

যতদূর জানা যায় হিন্দুধর্মের বয়স অনুর্দ্ধ সাড়ে চার হাজার বৎসর। কালের এ দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সময়ে সময়ের ব্যবধানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কাল দোষে দুষ্ট, বিকৃত ও প্রক্ষেপিত হয়ে অকৃত্রিমতা হারিয়ে ফেলেছে। এ সত্যকে স্বীকার করে হিন্দু জ্ঞানী গুণীজনেরা নিজেরাই যেসব মন্তব্য রেখেছেন তা হ'তে কিছুটা উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

১। অথর্ব বেদের কান্তপ সুক্ত, বাল্কিল্য সুক্ত ইত্যাদি রহুস্থানে প্রক্ষেপিত হয়েছে (*বেদ সর্বস্য পৃষ্ঠা ৯৭ পন্ডিত বৈদিক মুনি*)।

২। ভক্ত সানাই শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা একটা অদ্ভুত সংগ্রহ। ইহার ৪০ অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র ১৮টি অধ্যায় ব্যতীত সমস্তটাই প্রক্ষেপিত (*সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৬০ - পন্ডিত মহেশচন্দ্র প্রসাদ*)।

৩। ঋষিদের বর্ণিত বেদের শব্দ ও সংখ্যা বর্তমান বেদে নেই। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেদে বহু যোগ-বিয়োগ হয়েছে (*গঙ্গা, জানুয়ারী, ১৯৩১ পন্ডিত হৃদয় নারায়ণ*)।

৪। বর্ণনাকারী ও লেখকদের দোষে বেদের অকৃত্রিমতা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছে (*গঙ্গা, জানুয়ারী, ১৯৩২ ডঃ তারাপদ চৌধুরী*)।

৫। গোপথ ব্রাহ্মণ রচনার প্রাক্কালে প্রত্যেক বেদের সংকলক একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। প্রত্যেকে তার নিজেরটা সঠিক এবং অন্যগুলি কলুষিত বলে প্রচার করতো। এ সময়ে ও সুযোগে বেদে বেদে বহু পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণদের গ্রন্থাবলীর অংশ বিশেষও বেদে ঢুকে যায় (*বেদ সর্বস্য পৃষ্ঠা ১০৫-১০৯ পন্ডিত বৈদিক মুনি*)।

৬। বেদ রাশীর কলেবর প্রকান্ড। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হয়েছে (*ভারতে বিকেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৬১৩*)।

৭। প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনা বাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হয়ে গিয়েছে (*রচনাবলী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৫ বঙ্কিম চন্দ্র*)।

৮। ব্যাসদেব ৪৪০০ শ্লোক সংগ্রহ করেন। তার শিষ্য তাতে ৫৬০০ শ্লোক সংযুক্ত করে ১০০০০ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারত রচনা করেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে ২০০০০ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারত রচিত হয়। আমার পিতার সময়ে উহা ২৫০০০ এ বর্দ্ধিত হয়। আর আমার মধ্য বয়সে ৩০০০০ শ্লোক যুক্ত মহাভারত দেখেছি (*আলোক তীর্থ সঞ্জীবনী, পৃষ্ঠা ১৩৫ রাজা ভোজ*)।

৯। যে সব দৈত্যরা বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছে তারাই ৬০০০ শ্লোক বিশিষ্ট ভারতে নিত্য নূতন বিষয়ের অবতারণা করে নূতন নূতন শ্লোক নির্মাণ করে তা প্রক্ষিপ্ত করে চলেছে (*আলোক বন্দনা, পৃষ্ঠা ৬৯ গরুড় পুরাণ*)।

১০। বহু সরিতের জলে পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুল কলেবর মহাভারত হয়েছে (*রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৯০৩ বঙ্কিম চন্দ্র*)।

১১। গীতা গ্রন্থখানি ভগবৎ প্রণীত নহে। অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপন করে কৃষ্ণ ও অর্জুণ ১৮দিন বাক্যালাপ করেন। তাহাই ১৮ অধ্যায় সম্বলিত গীতা, যাহা শত্রুপক্ষের মন্ত্রী সঞ্জয় শ্রবণ করে ধৃত রাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করেন। সঞ্জয়ের মুখ নিঃসৃত কথাই লিপিবদ্ধ হয়ে গীতা প্রণীত হয়। কৃষ্ণার্জুণের কথোপকথন শত্রুপক্ষের মন্ত্রী সঞ্জয়ের পক্ষে শ্রবণ, বর্ণন ও লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হতে পারে না (*ঐ পৃষ্ঠা ৬৯৩*)।

১২। শ্রীমদভাগবত গীতা গ্রন্থখানি ব্যোপদেবের লিখিত (*সত্যার্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা ৩৭২, বাংলা বিশ্বকোষ- সুবল মিত্রের অভিধান*)।

১৩। ভাগবতকার কৃষ্ণ চরিত্রকে কলুষিত তো করেছেই, তা ছাড়া এমন সব যৌনলীলার নগ্নচিত্র দিয়েছে, সেজন্য এই পুস্তককে কদর্য গ্লানি বলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত (*আলোক বন্দনা, পৃষ্ঠা ৯৭*)।

১৪। বালক চিত্তরঞ্জনের জন্যে ধর্মগ্রন্থগুলিতে অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে হয়েছে (*বাঙ্গালির ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, পুরাণ প্রসংগ পৃষ্ঠা ৮৬*)।

১৫। রামায়ন সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ (১) ১০স্কন্দ বিশিষ্ট বাল্মিকী রামায়ন (২) ১০ স্কন্দ বিশিষ্ট কীতিবাসী রামায়ন। (৩) সহস্র স্কন্দ বিশিষ্ট অদ্ভুতাচার্যের রামায়ন। এক রামায়নের সাথে অন্যটার বর্ণনার কোন মিল তো নেই, আবার অদ্ভুতাচার্যের রামায়ন এক অদ্ভুত সংগ্রহই বটে। পূর্ব বঙ্গে একপ্রকার রামায়ন প্রচলিত পশ্চিম বঙ্গে অন্য প্রকার।

এভাবে আরো বহু উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দু ভাইয়েরা তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে নিজেরাই নানা সংশয়, সন্দেহবাদের ভোগান্তিতে ভুগছেন। কিন্তু এত প্রক্ষেপণ ও বিকৃতি সত্ত্বেও ধর্মগ্রন্থগুলির অনেকের মধ্যে এমন কিছু কিছু বর্ণনার উল্লেখ দেখা যায়, যা কুরআনের বর্ণনার সাথে হুবহু একই প্রকার এবং কুদরতওয়ালা খোদা আপন কুদরতে সে বাণীগুলি পবিত্র কুরআনে এবং উক্ত ধর্মগ্রন্থগুলিতেও অবিকৃত অবস্থায় হেফাযত রেখেছেন। ইহা মানুষের হস্তক্ষেপ হতে চিরমুক্ত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গ্রন্থগুলির সত্যতার স্বাক্ষর বহন করতে থাকবে। আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাইঃ (১) চির প্রশংসাময় প্রভু আপন প্রশংসা প্রকাশে যে সমস্ত বাণী বর্ণনা করেছেন মানুষ তাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে নি। সকল ধর্মগ্রন্থে সে বাণীগুলি একই প্রকার আছে। (২) ঐতিহাসিক কালজয়ী ঘটনাবলী যা কেয়ামত পর্যন্ত উদাহারণ বা দৃষ্টান্তস্বরূপ জিন্দা থেকে মানুষজাতিকে পথ-নির্দেশ করতে থাকবে। (৩) ভাবিকালে সংঘটিতব্য ভবিষদ্বাণীসমূহ যা পরিপূর্ণ বা সত্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ইলাহী হেফাযতে সুরক্ষিত থাকার জন্যে নির্দিষ্ট আছে। সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের নিমিত্তে কিছু কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

(১) ওয়ালাও আন্না মা ফিল্ আরদে মিন্ শাজারাতিন্ আক্লামুন ওয়াল বাহ্রো ইয়ামুদ্দুহু মিম বা'দিহী সাব্আতো আব্হোরেন, মা নাফেদাত্ কালেমাতুল্লাহ্ (*কুরআন ৩১ঃ২৮*)।

অর্থাৎ- এবং পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে যদি তা সবই কলমে রূপান্তরিত হয় এবং যে সমুদ্র আছে তৎসঙ্গে আরও সাত সমুদ্র পানি কালিতে পরিণত হয় এবং তদ্বারা প্রভুর প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়, কালি-কলম সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্র প্রশংসাবাণী শেষ হবে না।

অসিৎগিরি সমং স্যাৎ ফজজলং সিন্ধ পত্রে সুর তরুবর শাখা লিখনি পত্র মুর্বি লিখতি যদি গৃহিতা সারদা সর্বকালং তদ্পিতব গুনানামিশ্ পারং ন ঘাতি (বেদ)।

অর্থাৎ যদি সমস্ত সাগরে নীল পর্বত মিশ্রিত করে কালি তৈরী করা হয়, সমস্ত বৃক্ষ শাখাকে যদি কলম বানানো হয়, এবং পৃথিবী রূপ বিস্তৃত কাগজে অনন্তকাল ধরে প্রভুর গুণাবলীর প্রসংশা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু প্রভুর প্রশংসাবাণী সমাপ্ত হবে না।

(২) ছুম্মার জেয়েল বাছারা কার্রাতায়নে ইয়ান্কালেব এলায়কাল্ বাছারো খাছেয়াও ওয়া হুয়া হাছির (*কুরআন, ৬৭ ঃ ৫*)।

অর্থাৎ- অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর আল্লাহ্র সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি। পরিশেষে তোমার দৃষ্টি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার কাছে, কিন্তু সৃষ্টি-রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হবে না।

যত বাচো নির্বতন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ (উপনিষদ)।

অর্থাৎ প্রভুর সৃষ্টিকে উপলব্ধির জন্যে তোমার দৃষ্টি -চিন্তাকে সাধ্যমত প্রসারিত কর, কিন্তু তথাপিও তোমার মনষ্কামনা অপূর্ণই রয়ে যাবে।

(৩) লা তুদ্রেকোহুল আবছার ওয়া হুয়া ইয়োদরেকোল আবছার।

অর্থাৎ- দৃষ্টি তাঁর (প্রভুর) নাগাল পেতে পারে না, কিন্তু তিনিই আপন করুণা সহকারে দৃষ্টির নাগালে এসে থাকেন।

যচ্চক্ষুসা নঃ পষ্যতি, যেন চক্ষুংসি পষ্যতি (উপনিষদ)।

অর্থাৎ- কোন চক্ষুই তাঁকে (প্রভুকে) ধারণ করতে পারে না। তিনিই বরং চক্ষুর অন্তঃস্থলে এসে ধরা দেন।

(৪) আলা ইন্নাহু বি কুল্লে শাইয়িম মুহীত (কুরআন, ৪১ঃ ৪৫)।

অর্থাৎ- আবার শুন ! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

ইসাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চিত জগতাং জগৎ (উপনিষদ)।

অর্থাৎ- জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কিছুকেই তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন।

(৫) ওয়াহুয়াল লতীফুল খবীর (*কুরআন, ৬ ঃ ১০৫*)।

অর্থাৎ- তিনি সূক্ষাতি সূক্ষ্ম অথচ সকল কিছুই তিনি অবহিত আছেন।

সূক্ষাচ্ছ তৎসূক্ষ্মতরং বিজাতি সবেত্তিবেদং।

অর্থাৎ- তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর অথচ সর্বজ্ঞ।

(৬) ইয়োখ্রেজোহুম মিনায যুলুমাতে ইলান্নূর (*কুরআন- ২ ঃ ২৫৭*)

অর্থাৎ- তিনি তাদিগকে (মানুষদিগকে) অন্ধকার হতে আলোর দিকে বহির্গত করেন।

তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি (উপনিষদ)। অর্থাৎ- (হে প্রভু !) আমাদিগকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে গতি দান কর।

(৭) ইয়া নারো কুনি বারদাঁ ওয়া সালামান 'আলা ইব্রাহীম (*কুরআন- ২১ঃ ৭০*)। অর্থাৎ- হে আগুন ! তুমি ইব্রাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।

ব্রহ্মা সর্ব জবেন তন্ন শশাক দগ্ধম (উপনিষদ)।

অর্থাৎ- ব্রহ্মাকে (ইব্রাহীমকে) তো দূরের কথা আগুন তাঁর একটা তৃণ (কেশ) পর্যন্ত দগ্ধ করতে সক্ষম হয় নি।

(৮) আল্ কুরআনে যেমন নূহ (আঃ)-এর সময়ের প্লাবনের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে, হিন্দু ধর্ম গ্রন্থেও তেমন মনুর সময়ের প্লাবনের বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষাগত পার্থকের কারণে উভয়ের নামের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও প্লাবন বর্ণনার সাদৃশ্য দৃষ্টে এটা নিশ্চিত যে, উভয় ছিলেন একই ব্যক্তি (চলবে)।

-- শেখ জোনাব আলী

প্রসঙ্গ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশ বাস

আ-আহমদী মুসলমান ভাই যারা ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে আজও ইসলামের পবিত্র সংস্কারক হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি তাদের সবারই বদ্ধমূল ধারণা ও একীন এই যে, খৃষ্টধর্মের নবী হযরত ঈসা (আঃ) বিগত দুই হাজার বছর অবধি চৌথাকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এবং আখেরী জমানায় তিনিই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাগমনপূর্বক পথভ্রষ্ট মুসলমান জাতিকে পবিত্র পথের সন্ধান দানের পর মৃত্যুবরণ করবেন। বর্তমানে যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ হিসাবে দাবী করেছেন তাঁর দাবী মিথ্যা। এহেন কিম্ভূতকিমাকার বিশ্বাস নিমিত্তে আমার অন্তঃপুরে কতক প্রশ্নোদ্রেক হয়, যা নিশ্চিৎ নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। সেসব প্রশ্নের কতিপয় আমি এখন পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপন করব বলে মনস্থ করেছি। যদি কারোর নিকট হতে এ-সবগুলো প্রশ্নের যথোপযুক্ত ফয়সালা পাই তবেই শান্তি। নচেৎ অনুসন্ধিৎসু আত্মার পিপাসা অতৃপ্তই থেকে যাবে ঃ

(১) আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী খৃষ্টান জাতিকে 'দাল্লিন' (পথভ্রষ্ট) বলে আখ্যায়িত করেছেন অথচ সেই জাতির নবীই আকাশ থেকে পুনঃ অবতরণপূর্বক মুসলমান জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়িত্ব নিবেন এবং পুণ্যময় জীবনের অধিকারী করবেন, তা কেমন করে সত্য হয় ? হযরত ঈসা জাতিকে সেই ঘৃণ্য অপবাদ থেকে অবমুক্ত না করে তিনি অন্য নবীর অনুসারীকে উদ্ধারকল্পে নিয়োজিত হবেন তা কেমন অভিলাষ ? তা কি কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কান্ড বলে বিবেচিত হয় ? তাই প্রবাদ বলে, "আপন ছেলে জাল্লা, আর পরকে শিক্ষা দেয় কীভাবে চিনবে আল্লাহ্"।

(২) নবীরূপ পিতার কথা বাদই দিলাম জগতে এমন কোন সাধারণ পিতার সন্ধান পাওয়া যাবে কি, যে পিতা দূরে বসে নিজ সন্তানের ওপরে প্রদত্ত অভিশাপ এবং তাদের অধঃপতন পর্যবেক্ষণ করবেন আর তিনি নিজে চিন্তানন্দে নির্দ্বিধায় দিন গুজরান করবেন ? বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে অবস্থানরত দীর্ঘ জীবনের চিত্র অনেকটা তদ্রূপেই বিবেচিত হয়। কেননা, একদিকে তাঁর অনুসারী খৃষ্টান জাতি তিন খোদার অর্চনায় মত্ত। অন্যদিকে রসূলে করীম (সঃ)-কে স্বীকৃতি প্রদান না করে লাঞ্ছনা করার অপপ্রয়াস, এর প্রত্যেকটাই ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিতান্তভাবে নিন্দনীয় কাজ, অথচ ঈসা (আঃ) আকাশে বসে সেসব কেবল দেখেই গেলেন, কিন্তু বিন্দুবৎ তার কোন বিহিত ব্যবস্থা নিলেন না। সুতরাং এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে কি আমরা তাঁকে ধর্মের একজন আদর্শ অভিভাবক বলে মেনে নিতে পারি ?

(৩) ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে খৃষ্টান জাতি গোমরাহ্ ও বিপথগামী বলে স্বীকৃত হয়েছে. কিন্তু এন্তার আফসোস এখানেই যে, হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর জাতিকে এমনিতর অপমানকর অপবাদের প্রতিবাদে কোন প্রকার পত্র কিংবা আকাশ বাণীর মাধ্যমে নবী শ্রেষ্ঠ (সঃ)-এর নিকটে কোনই ওজর-আবদার করলেন না ? অথচ যদি হযরত ঈসা (আঃ) এ মর ধরায় অবস্থান করতেন তবে হয়ত তাঁর প্রত্যক্ষে তাঁর জাতিকে এমনি ধরনের এলজাম দেয়া সম্ভব হতো না, আর দিতে গেলেও হয়ত তিনি তখন রসূলে করীম (সঃ)-এর সকাশে সবিনয় আর্জি রেখে অবশ্যই তার একটা উত্তম ফয়সালা করিয়ে নিতেন, সত্য নয় কি ?

(৪) একজন নবী জীবিত থাকা অবস্থায় (যদিও তিনি আকাশে জীবিত নেই) কীভাবে হযরত রসূলে পাক (সঃ) বিশ্বের তাবৎ মানুষের জন্য মনোনিত রসূলের দাবী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করলেন ? যদি তিনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এমন দাবী করার অধিকার পেয়েই থাকেন (অবশ্যই পেয়েছেন) তবে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীগণের তখন কি এ দায়িত্ব ছিল না যে, তাঁর হাতে বিনা প্রতিবাদে বয়াত হন ? কিন্তু তখন কি তিনি অথবা তাঁর জাতি তেমনটি করেছিলেন ? নিশ্চয় তা করেন নি, বরং করেছেন এর উল্টোটা। সুতরাং এর জন্য কি হযরত ঈসা ও তাঁর জাতি খোদাতাআলার দরবারে জিজ্ঞাসিত হবেন না ?

(৫) যেহেতু কেবল মুসলমান জাতিই আখেরী যমানায় পথভ্রষ্ট হবেন আর সেজন্যই হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে প্রত্যাগমনপূর্বক বিপদগামী মুসলমান জাতিকে পবিত্র পথের সন্ধান দিয়ে পুণ্যবান করবেন। সেহেতু এখানে এই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেবল মুসলমান ব্যতীত অন্য সব ধর্মের অনুসারীদের আর কেউ ভ্রষ্টপথের পথযাত্রী হবেন না, যদি তা-ই সত্য হয়, তবে কেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ নবী আঁ হযরত (সঃ) খৃষ্টানসহ অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে তাদের জীবনকে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার পথে নিয়ে আসার অহেতুক চেষ্টা করলেন ? (আল্লাহ্ অতীব পবিত্র)।

(৬) ঈসা (আঃ) তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে বধির, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতে পারতেন। সুতরাং যদি তিনি অদ্যবধি পৃথিবীতে অবস্থান করতেন তবে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কত অসংখ্য রোগীকেই না তিনি আরোগ্য দান করতে পারতেন, তা কি ভাবা যায় ? কিন্তু তাঁর আকাশে অবস্থান হেতু আমরা আজ এহেন সুবর্ণ সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে আছি। অথচ বহুবিধ গবেষণা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও আমরা আজ এসব রোগের দুষ্ট-নিষ্ঠুর ছোবল হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে পারছি না। আমরা জানি যে, মানব কল্যাণ সাধনই হচ্ছে নবী-জীবনের ব্রত, অথচ তিনি তা না করে কোন্ আকিঞ্চনে অম্বরে আসন গেড়ে বসে রইলেন ?

(৭) যদি তিনি আকাশে বাস না করে যমীনে বসবাস করতেন তবে সেদিন আঁ হযরত (সঃ)-এর তিরোধানকালে অন্যান্য সাহাবা কেরামগণের প্রত্যেকেই ঈসা (আঃ)-কে আখেরী যামানার সেই গুরু দায়িত্বটিকে উত্তমভাবে সমঝিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন। অথবা স্বহস্তে লেখা একখানা সনদপত্র দিয়ে যেতে পারতেন, যার সুবাদে হেদায়াত দানের এ কাজটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিজের জন্য এবং মুসলমানগণের উভয়ের জন্যই অধিকতর সহজ হতো, তা নয় কি ?

(৮) আজ প্রায় দুই হাজার অব্দ পূর্বে পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন। যদি তিনি অদ্যবধি আকাশে না থেকে মর্ত্যে থাকতেন তবে আমরা বিগত দুই হাজার বছর পূর্বের বহু মূল্যবান তথ্য ও ঘটনার কথা তাঁর পবিত্র মুখ হতেই জানতে এবং শ্রবণ করতে সক্ষম হতাম। যার ফলে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তরভাবে বৃদ্ধি পেতো এবং ইতিহাস গবেষণার কাজ অধিক সহজতর হতো। কিন্তু তিনি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আকাশে অবস্থান করার কারণে আমরা এই মূল্যবান পাওয়া হতে বঞ্চিত রইলাম। ইহা কি আমাদের জন্য একান্তভাবেই নসীব মন্দের কারণ নয় ?

(৯) ইহা খোদাতাআলার অমোঘ বিধান যে, একজন নবী যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর লব্ধ নবুওয়তের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয় না। সেই সুবাদে নবীগণ আমৃত্যু স্বধর্ম প্রচারের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে নিজ ধর্মের অনুগামী করে পুণ্যময় জীবন দানের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে থাকেন। এহেন দায়িত্ব পালনই হচ্ছে প্রত্যেক নবীর জন্য নির্ধারিত কাজ, অথচ হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর ওপরে অর্পিত এ দায়িত্ব পালন না করে বিগত প্রায় দুই হাজার বছর দিব্যি আকাশে বসে রইলেন, ইহা কোন্ বিধান মূলে সমীচীন হচ্ছে ?

(১০) যদি হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে না থেকে পৃথিবীতে বসবাস করতেন তবে খাতামান্ নবীঈন (সঃ)-এর আগমন-পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ছয়শত বৎসর নাগাদ তিনি অব্যাহতভাবে তাঁর ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে বহুসংখ্যক

বিধর্মীকে খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী করে পবিত্র জীবনের অধিকারী করতে সক্ষম হতেন। আর রসূলে করীম (সঃ)-এর দাবীর সাথে সাথে তিনি তাঁর এক মস্ত বড় দলসহ বিনা প্রতিবাদে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে পারতেন। কারণ যেহেতু তিনি স্বয়ং একজন নবী, সেহেতু পূর্ব হতেই তিনি অহী-ইলহামের মাধ্যমে রসূলে করীম (সঃ)-এর আগমন-বার্তা জ্ঞাত হতেন এবং চিনে নিতে সক্ষম হতেন। বরং তেমনটি না হয়ে রসূলে করীম (সঃ)-কে তাঁর ধর্ম প্রচার কার্য চালাতে গিয়ে খৃষ্টান জাতির বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-জেহাদ করতে হয়েছে এবং বহুভাবে তাদের দ্বারা কত উৎপীড়ন এবং যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। আখেরী যামানায় যদি হযরত উমর (রাঃ)-এর মত এমন কোন বৈপ্লবিক মুসলমান সেই উৎপীড়নের দাদ্ নেয়ার রোষে ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তবে ব্যাপারটা কেমন উদ্ভট হবে তা কি ভাবা যায় ?

(১১) আহমদী ছাড়া অন্যসব মুসলমানগণের দাবী এবং যুক্তি হচ্ছে ঈসা নবী (আঃ) খোদাতাআলার অলৌকিক ক্ষমতা বলে বিনাহারেই আকাশে বেঁচে আছেন। পক্ষান্তরে কুরআন বলে "তিনি খাদ্য খাইতেন" (৫ঃ৭৬)। এখানে দু'টি উক্তির মধ্যে বিপরীত অর্থ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং তা কীভাবে গ্রহণীয় হয় ? 'তিনি খাদ্য খেতেন' বাক্য দ্বারা অতীত কালকে বুঝায় অথচ হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে এসে পুনরায় খাদ্য খাবেন। কিন্তু কুরআন বলে, তিনি খাদ্য খেতেন; এখন আর খান না এবং ভবিষ্যতেও তিনি আর জাগতিক খাবার খাবেন না। এতদুভয়ের কোন্ উক্তিটি আমরা গ্রহণ করব, কুরআনের কথা, নাকি সাধারণ মুসলমানের কথা ?

(১২) মোল্লা-মৌলবীগণ ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নবী আগমনের দ্বারে কপাট লাগিয়ে এক ভীষণ সংকটের যাঁতাকলে নিপতিত হয়েছেন। ফলেই তারা সাতিশয় কষ্ট ও চতুরতায় ফন্দি-ফিকির সন্ধান করে বিশ্ব-নবী (সঃ)-এর আগমনের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বের বনী ঈসরাঈলী জাতির জন্য আগত নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে আজ অবধি চৌথা আসমানে সশরীরে জীবিত রাখার চেষ্টায় রত এবং আরও যে কতকাল জীবিত রাখবেন তারও সঠিক হিসাব তাদের জানা নেই। একজন লোক সঙ্গী-সাথী বিহীন আহার নিদ্রা ও কর্মহীন অবস্থায় কীভাবে যে এতদিন জীবিত আছেন এবং থাকবেন তার চিন্তা সুস্থ মস্তিষ্কগুলোকে যথার্থই উম্মাদ করে তোলে।

(১৩) হযরত ঈসা (আঃ)-ই একমাত্র খোদার সৃষ্ট মানুষ যিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ঘোষণা দিতে পারতেন যে, "হে নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সঃ) ! আপনি নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট বয়স প্রাপ্তির পর পরলোক গমন করবেন। কিন্তু আমি আজ প্রায় ছয়শত বৎসর নাগাদ জীবিত আছি এবং ইহাও নিশ্চিত যে, যে কোন রোগ-বালাই কিংবা প্রতিকূলতার নিগ্রহ সত্ত্বেও জীবিত থাকব এবং তৎপর আপনার মুসলমান জাতিকে অধঃপতনের কোপাগ্নি থেকে উদ্ধার করতঃ মৃত্যুবরণ করব। এর পূর্বে নির্ঘাত আমি মৃত্যুবরণ করব না এবং ভবিষ্যতে আপনার উম্মতের মধ্যে আপনার প্রদেয় হাদীস, কুরআন ও সুন্নাহ্ নিয়ে যেসব মত বিরোধ সৃষ্টি হবে তা আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে উপস্থিত থেকে তার উত্তম ফয়সালা করে দিয়ে পরে মৃত্যু বরণ করব। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার ভাবনায় আর কিছুই রইল না।" এই উক্তির ফলে কি বিশ্ব-নবী (সঃ)-এর উৎকর্ষতার মান ক্ষুণ্ন হতো না ?

(১৪) হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে এসে যদি মুসলমান জাতিকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোতে আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভের শিক্ষা দান করেন (প্রশ্ন হলো তিনি কুরআন শিখবেন কীভাবে) তবে স্বধর্মানুসারী খৃষ্টান জাতি কি এহেন দ্বিমুখী আচরণ ও কার্যকলাপের জন্য তাঁর (ঈসা-আঃ) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে না ? পক্ষান্তরে তিনি তা না করে যদি মুসলমানদেরকে হাদীস কুরআন পরিপন্থী তিন খোদার আরাধনা করার আহ্বান জানান তবে এই আহমদীয়া মুসলিম জামাত যারা প্রাণের চেয়েও ইসলামকে অধিক ভালবাসেন তারা অপচেষ্টার মোকাবেলায় দন্ডায়মান হবে না কি ?

হে সুপ্রিয় পাঠক এবং যুক্তির ভক্তবৃন্দ ! বনী ইসরাঈল জাতির নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে অদ্যবধি শূন্যাকাশে সশরীরে জীবিত রাখার নিমিত্তে যেসব জটিলতর প্রশ্নের অভিঘাত আমার কল্পনা জগতকে প্রায়শ:ই যন্ত্রণা দেয় এবং অস্থির করে তোলে তার মাত্র কিয়দংশ আপনাদের সকাশে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম। জানি না এসব অবান্তর-কিছু কিনা। যদি অবান্তর কিছু না হয়ে থাকে এবং উক্ত জিজ্ঞাসাগুলো হতে যদি সত্যই আপনি কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও চিন্তার খোরাকের সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে নির্মল, নিরহংকার ও নির্ভেজাল চিত্ত নিয়ে আর একধাপ এগিয়ে আসুন এবং এহেন অলীক বিশ্বাসের নির্মমতা থেকে স্বীয় আত্মার পবিত্রতাকে হেফাযত করার চেষ্টা করুন। নচেৎ এই কুৎসিৎ বিশ্বাস আপনার ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় সঞ্চিত সম্পদকে প্রলয়ংকারী ঝড়ের ক্ষমতায় সর্বনাশ করে দিবে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনার এই উদাসীনতা ও অযোগ্যতা আপনার আত্মার মুক্তির পথকে রুদ্ধ করে দিবে। ইহা বেনজীর সত্য যে, হযরত আদম নূহ এবং মূসা (আঃ) যেমন মানুষ ছিলেন তেমনি হযরত ঈসাও একজন মানুষ বৈ কিছুই নন। তিনিও তেমনিভাবে আহার-নিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, যেমনি ছিলেন আর সব নবী ও রসূলগণ। তাঁর আত্মাও তেমনিভাবেই আকাশে অবস্থান করছে যেমনিভাবে অন্যসব নবী ও সজ্জনের আত্মা সেথায় অবস্থান করছে। সুতরাং সে অবস্থান হতে তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর আত্মা বিলক্ষণ আর মর্ত্যপৃষ্ঠে পুনশ্চ প্রত্যাগমন করবে না। তাই বলতে দ্বিধা নেই যে, যিনি সেই ঈসারই পুনঃ আগমনের অলীক বিশ্বাস পোষণ করেন তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হবেন এবং তার আধ্যাত্মিক সওদার সর্বৈব বিনাশ সাধিত হবে। তবে ইহাও প্রকৃষ্ট সত্য যে, রসূলে করীম (সঃ)-এর ভাবী বাণী মতে মুসলমান জাতিকে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আখেরী যমানায় যে সংস্কারক যেভাবে, যখন যেখানে, যে কর্মতালিকাসহ পৃথিবীতে আগমন করার বৃত্তান্ত রয়েছে তিনি বিলকুল সেভাবেই সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন এবং নির্ভীক নিনাদে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, "হে খোদার প্রিয় বান্দাগণ ! আমিই সে ঈসা, যাঁর আগমনের প্রত্যাশায় তোমরা প্রায় দেড় হাজার বছরকাল যাবৎ উর্ধাকাশে তাকিয়ে দিন গুজরান করছ। যদি তোমরা প্রকৃতই আত্মার মুক্তি চাও তবে সেই ভিত্তিহীন বিশ্বাস পরিত্যাগ কর এবং আইস আমার এই ডিঙ্গায়, আর অভিযাত্রী হও সেই কাফেলার, যাদেরকে শাফায়াত করবেন বলে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সেদিন ওয়াদা করে গিয়েছিলেন। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তোমাদের কল্পনামতে যে ঈসা আকাশ থেকে আগমন করার কথা সে মরিয়ম তনয় ঈসা আর কখনও পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করবে না। ইতঃপূর্বে সেই আশা নিয়ে বহুজন মৃত্যু বরণ করেছে, তোমরাও চলে যাবে এবং তৎপর তোমাদের সন্তানগণও ঠিক একইভাবে আকাশপানে চেয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, তবু তোমরা তোমাদের কল্পনার সেই ঈসাকে আর আকাশ থেকে অবতরণ হতে দেখবে না। সুতরাং তোমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে ইহাই যে, তোমরা আমার দাবীকে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম মানদণ্ডে বিচার করে আমাকে যুগের প্রতিশ্রুত ও মাহদীরূপে গ্রহণ করা এবং আমার অনুরূপ প্রচেষ্টায় ইসলাম সেবায় ব্রত হওয়া। নচেৎ জীবন-সন্ধিক্ষণে কেবল অনুতাপই হবে তোমাদের সর্বস্ব সম্বল"।

হে সরল চিত্তধারী সত্যান্বেষী বন্ধুবর ! আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমি আপনার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করার প্রয়াসে কিছু লিখে গেলাম মাত্র। এতদ্বিনিময়ে যদি আপনি খোদা-প্রদত্ত সত্যের সন্ধান পেয়ে যান তবেই আমি সার্থক। আশা করি সর্বশক্তিমান স্রষ্টার শাসন ত্রাসকে স্মরণ করে আপনি অবশ্যই এখানে আপনার বিবেক-বুদ্ধিকে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

– মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসার সময় গোটা রাবওয়া একটি বিরাট জলসাগাহে পরিণত হয়েছিলো

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইংল্যাণ্ডের ৩৪তম বার্ষিক জলসার সময় রাবওয়ার অধিবাসীরা অসাধারণ আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সারা প্রোগ্রাম শুনলেন। স্থানীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেবান-এর ১৮ই জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ জলসার প্রস্তুতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তারা নিজ নিজ মহল্লায় ডিশ-এর কেন্দ্রগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেন। বসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ডিশও টিভি-তে কোন ত্রুটি থাকলে উহা সময় মত মেরামত করিয়ে নেন। রাবওয়ার সকল অধিবাসীকে পুনঃ পুনঃ এই পয়গাম পৌছানো হউক যে, বার্ষিক জলসার দিনগুলোতে হুযূর আকদস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলার বক্তৃতাসমূহ ও অন্যান্য প্রোগ্রামের সময় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, অপরাপর সব কর্ম-ব্যস্ততা যেন পরিহার করা হয়। সড়কে অপ্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচল যেন বন্ধ রাখা হয়, যাতে করে যানবাহনের শোরগোল প্রোগ্রাম শুনতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। প্রসিডেন্ট সাহেবানকে নির্দেশ করা হলো যেন তারা নিজে এবং তাদের টিমগুলো পরিদর্শন করে সব ব্যবস্থাকে নিশ্চিৎ করেন।

স্থানীয় আঞ্জুমানের পক্ষ হতে জলসার প্রোগ্রাম ৬ হাজারের অধিক প্রকাশ করে মহল্লায় মহল্লায় পৌছিয়ে দেয়া হলো এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবান ঐগুলোকে ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেন। কোন কোন মহল্লায় প্রোগ্রাম কম্‌তি দেখা দিলে তাদিগকে চাহিদা অনুযায়ী আরো পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাই হুযূর আকদসের খুতবা এবং অন্য তিনটি বক্তৃতার সময় রাবওয়ায় পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, সব বাজার, দোকান-পাট বন্ধ ছিল। স্থানীয় আঞ্জুমানের ভাসমান টিমগুলো তাদের রিপোর্টে বলেছে যে, রাবওয়ার অলিগলি অতিক্রম করার সময় ডান বাম সকল দিক হতে জলসার প্রোগ্রামের আওয়াজই কানে আসতে থাকে। এই তো তেলাওয়াত হচ্ছে, আগে গেলে শুনা গেল নযম শুরু হয়ে গেছে; অতঃপর হুযূর আকদসের বক্তৃতার সুমধুর ও যাদুকরী আওয়াজ প্রত্যেক গলি ও প্রত্যেক বাড়ী থেকে শুনা যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন গোটা রাবওয়া বিরাট জলসাগাহে পরিণত হয়েছে। যার মধ্যে রাবওয়ার সকল অধিবাসী তাদের প্রিয় নেতাকে ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে টিভি স্ক্রিনে উজ্জ্বল ছবিতে প্রত্যক্ষ করছিল। ধ্যান মগ্নতা ও প্রফুল্লতার এক চমৎকার পরিবেশ ছিল। যখন হুযূর আকদস গত বৎসর এক কোটির উপর আহমদী হওয়ার ঘোষণা দিলেন তখন রাবওয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে আনন্দ উল্লাসের ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো। প্রত্যেকটি ঘর থেকে প্রশংসা ধ্বনি, গুণকীর্তন, আল্লাহো আকবার, আল্‌হামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ্‌র ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে লাগলো। আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্যে মহল্লায় মহল্লায় এবং অফিসে সম্মিলিতভাবে মিষ্টি পরিবেশন করা হলো।

আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় রাবওয়াবাসীর আনন্দ ও উৎফুল্লের অপূর্ব দৃশ্য দেখার মত ছিল। তিন দিনের প্রোগ্রামের মধ্যেই সকল পুরুষ ও মহিলাগণ অশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং রূহানী আবেগ ও ভক্তিপ্লুত হৃদয়ের সাথে অংশ গ্রহণ করেন; সারা রাবওয়ার উপর দোয়া দুরূদ, যিকরে ইলাহী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঝোঁকার ঈমানবর্দ্ধক প্রভাব আচ্ছন্ন ছিল। তারা সকল দুনিয়াবী প্রোগ্রাম ও কর্মব্যস্ততা পরিহার করে কেবল জলসার প্রোগ্রাম ও জলসার ব্যস্ততার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে রেখেছেন। প্রত্যেক ঘরে জলসা হচ্ছিল, সারা রাবওয়া জলসাগাহে পরিণত ছিল।

এই জলসা সালানার তিন দিনেরই এই সন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ঐ সময় একবারও বৈদ্যুতিক গোলযোগ সৃষ্টি হয় নি, অথচ ইতঃপূর্বে প্রায় প্রত্যেক দিনই দিনরাত কিছু কিছু ব্যবধানে বৈদ্যুতিক লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো এবং জলসার পরেও এই ধারা বলবৎ রয়েছে; এইদিক দিয়ে রাবওয়াবাসীরা অবশ্য উদগ্রীব ছিলেন; তারা সদরে উমুমী সাহেবের প্রচেষ্টাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ বলবৎ রেখেছেন এবং জলসা সালানার নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাতে উক্ত বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইংল্যান্ডের ৩৪তম বার্ষিক জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে আইভরীকোষ্টের রাষ্ট্রপতির বাণী সেই দেশের ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রী পড়ে শুনান।

আমরা আহমদীয়া জামাতের উন্নতিকে সালাম করি– রাষ্ট্রপতি, আইভরীকোষ্ট

উপস্থিত সকল শ্রোতামণ্ডলীকে আস্‌সালামু আলায়কুম বলার পরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এই জলসায় আইভরীকোষ্টের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আমি আমার প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যসহ যোগদান করে অত্যধিক আনন্দবোধ করছি। রাষ্ট্রপতি মহোদয় এই জলসায় যোগদান করার শুভেচ্ছাপূর্ণ আমন্ত্রণ পেয়ে এই অধমকে তাগিদ করলেন যেন পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন মির্যা তাহের আহমদ সাহেব এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই মহব্বত ও প্রীতিসুলভ আমন্ত্রণ অবশ্যই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শুভকামনার আবেগ প্রকাশ করছে এবং আইভরীকোষ্ট সরকার ও দেশের জনগণের আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেইগুলিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অংশ গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশ করছে। আইভরীকোষ্টে ১৯৬৩ইং সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়া জামাত জনগণের ধর্মীয় সেবা ছাড়াও মানুষকে ভাল মানুষে উন্নীত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাষ্ট্রপতি মহোদয় এই বিষয়েও অনেক আনন্দ বোধ করছেন যে, আহমদীয়া জামাতের এবং রাষ্ট্রপতির ধ্যান-ধারণা ও মতামতের মধ্যে মিল্ ও সামঞ্জস্য রয়েছে। আইভরীকোষ্ট সরকারের প্রতিনিধি দলের এই জলসায় যোগদান করাও এই কথার ইঙ্গিত বহন করছে যে, শুভ ইচ্ছা ও কল্যাণকামী এই সরকারের প্রতি আহমদীয়া জামাতের সমর্থন ও সহায়তা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি মহোদয় তাঁর বাণীতে এই কথা ব্যক্ত করেছেন যে, আপনারা অবশ্যই উত্তর-দক্ষিণে সংঘটিত নির্যাতনের কাহিনী টিভিতে শুনছেন, হত্যা ও ক্ষুধার নিপীড়নের মর্মস্পর্শী বৃত্তান্তও শুনছেন। আইভরীকোষ্ট একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যেখানে নিরাপত্তা ও শান্তি, সহনশীলতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরাজমান। এই দেশে ভ্রাতৃত্ববোধ শব্দটি স্বর্ণাক্ষরে লেখার উপযুক্ত। আইভরীকোষ্ট সরকারের জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্য এই যে, যেন মানুষ মানুষের মধ্যে মনের শান্তি, আত্মার শান্তি স্থাপিত হয়। আমি আমার পক্ষ হতে, রাষ্ট্রপতির পক্ষ হতে এবং আমার জনগণের পক্ষ হতে জামাতে আহমদীয়ার উন্নতি ও প্রগতিকে সালামের উপঢৌকন পেশ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ দেশে মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এর সাথে সাথে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রেখেছে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নির্মিত কতিপয় হাসপাতালের ও সেবা প্রসঙ্গে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, আমরা জানি যে, এই প্রকারের আরো চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা তাঁরা হাতে নিয়েছেন।

ধর্মমন্ত্রী সর্বশেষে বল্‌লেন যে, অধমের প্রতি যে প্রাণঢালা স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়েছে এর শুকরিয়া না জানিয়ে থাকতে পারছি না। নিঃসন্দেহে আমরা পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতির সূত্রে এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে অবশ্যই সক্ষম হব যেখানে শান্তিই শান্তি বিরাজ করবে এবং আমরা রসূলুল্লাহ সলাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুশিক্ষার সুন্দর অনুসারী হতে পারব। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলের উপর দয়াবান হউন; তাঁর অশেষ দয়া ও আশীষ আমাদের সকলের সঙ্গী হয়ে থাকুক, আমীন।

(দৈনিক আলফযল, রাবওয়ার সৌজন্যে)

অনুবাদ ঃ আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী

তাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে ?

"আর তাহার চেয়ে বড় যালেম কে আছে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয়, এবং উহাদের বিনাশের চেষ্টা করে" ? (সূরা বাকারা)

"হে ঈমানদারগণ যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের কথা মানো এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইও না, উহা শুনার পর এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা বলে, আমরা শুনিলাম কিন্তু আসলে শুনে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সব চেয়ে নিকৃষ্ট জীব সেই সকল বোবা ও বধিরগণ তাহারা বুঝিতেছে না" "আল্লাহ্‌র নিকট তাহারাই হায়েওয়ানদের চাইতেও নিকৃষ্ট যারা হলো এমন বধির ও বোবা তারা কিছুই বুঝতে চায় না" "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট প্রাণী হলো ঐ সকল লোক যারা অস্বীকার করেছে।" (সূরা আনফাল) "তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদেরকে ঐ সকল লোকের অবস্থা জানাব, যাদের প্রতিফল তার চাইতে নিকৃষ্ট (যাকে তোমরা অপসন্দ করে থাক) তারা হলো ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেছেন ও যাদের উপর (তাঁর) গযব পতিত হয়েছে এবং যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বানর, শূকরানুরূপ করেছেন এবং যারা সীমালঙ্ঘনকারীদের দাসত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। এদের অবস্থান হলো নিকৃষ্ট দুষ্কৃতিপূর্ণ এবং তারা সোজাপথ থেকে চরম পর্যায়ে বিভ্রান্ত" (সূরা মায়েদা)।

পবিত্র কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতগুলির আলোকেই হযরত রসূল করীম (সঃ) স্পষ্টাক্ষরে বলে গেছেন যে, আখেরী যমানায় ইসলামে যে সকল হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহ, মারামারি, ধর্মের নামে খুনা-খুনি, রক্তা-রক্তি, ফেতনা-ফাসাদ দলা-দলি ইত্যাদি সংসারাসক্ত আলেম-ওলামাদের পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হবে। হুযূর (সঃ) বলেছেন, "শেষ যুগে আলেমগণ হবে আকাশের নীচে নিকৃষ্ট ধরনের দুস্কৃতকারী। ফেতনা-ফাসাদ তাদের থেকে জন্ম নিবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে" (মিশকাত কেতাবুল ইলম এবং কানযুল উম্মাল ষষ্ঠ খন্ড, ৩৮৫ পৃঃ)। মানুষ যখন ধর্মীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাদের কাছে যাবে, তখন তাদেরকে দেখতে পাবে কেউ বা 'বানর' কেউ বা 'শূকর' ইত্যাদি" (কানযুল উম্মাল ৭ম খন্ড, ১৯০ পৃঃ)। আল্লাহ্ ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণীগুলি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে স্বচ্ছ আয়নার মত চোখের সম্মুখে ঝলমল করছে। বড় বড় ডিগ্রী লাভ করতঃ খেতাব প্রাপ্ত হয়ে কুরআন হাদীস মুখস্থ করে যারা আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে তাঁহার নাম লইতে বাধা দান করে, খোদার ঘর মসজিদ ভাঙ্গতে এবং কুরআন হাদীস পোড়াতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে তাদেরকেই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বধির, বোবা, ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করতঃ বানর, শূকর, ভারবাহী নিকৃষ্টতম জন্তুরূপে অভিহিত করেছেন। বানর, শূকর, কুকুর ইত্যাদি জন্তু আকৃতির জন্য নিন্দনীয় নহে, কার্যকলাপের জন্যই নিন্দনীয়। নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম ওলামা ও পীর মুর্শিদগণ শুধু তাদের বুযর্গীর কথাই বর্ণনা করে থাকেন কিন্তু উপরোক্ত হাদীস ও এগুলির মূল কুরআন করীমের আয়াতগুলিকে তারা লুকাতে চান।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআন করীমে একথা ঘোষণা করেছেন যে, মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "মানুষ সকলেই এক আদমের সন্তান, আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে"। কিন্তু মাটি থেকে সৃষ্টি মানুষের দেহটি আসল মানুষ নয়। আসল মানুষ হচ্ছে তার আত্মা বা রূহ। এই আত্মা বা রূহ মাটির তৈরী নয়। ইহা উর্দ্ধ জগতের বস্তু। ইহাকে চর্ম চক্ষুতে দেখা যায় না। ইহার আকার নেই, সীমা পরিসীমা নেই। মানব চক্ষুর অন্তরালে বিরাজমান। জড় চক্ষুতে ইহাকে দেখা না গেলেও খোদা-ভীরু সাধক জ্ঞানবানগণ ইহাকে জ্ঞান চক্ষুতে দেখে থাকেন। মানুষ মাটি দ্বারা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আত্মা বা রূহ তাকে এমনি মর্যাদা দান করেছে যে, যার ফলে মানুষ অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া সৃষ্টির দিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। মানুষের যেমন হাত পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গ আছে চতুষ্পদ জন্তুদেরও হাত, পা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি আছে। মানুষ যেমন ক্ষিদে পেলে আহার করে, রাগ হলে প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে পরস্পর ঝগড়া-কলহ মারা-মারিতে লিপ্ত হয়ে একে অন্যকে আক্রমণ করতঃ বাহাদুরী প্রকাশ করে, তদ্রূপ চতুষ্পদ জন্তুরাও ক্ষিদে পেলে আহার করে, রাগ হলে একে অন্যকে আক্রমণ করতঃ ঝগড়া-কলহ মারা-মারিতে লিপ্ত হয়। মানুষ যেমন আহার করে নিদ্রা যায় এবং তার কাম সুলভশক্তিকে চরিতার্থের দ্বারা সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে থাকে তদ্রূপ চতুষ্পদ জন্তুরাও আহার করে নিদ্রা যায় এবং তাদের কাম শক্তিকে চরিতার্থের দ্বারা বাচ্চা পয়দা করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব কেন ? করুনাময় আল্লাহ্‌তাআলা বড়ই মেহেরবানীপূর্বক মানুষকে 'বিবেক' নামক কষ্টি পাথর দান করেছেন যার সাহায্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু চতুষ্পদ জন্তুদের বিবেক-বুদ্ধি নেই। আবার সৃষ্টির সেরা এই মানুষকেই সত্য এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্য আসমানী কেতাব সহ লক্ষ লক্ষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু পশুদের জন্য কোন নবী-রসূল আসে নি। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ কি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ইত্যাদি যালেমানা কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেয়েছে ? সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী বড় বড় খেতাবপ্রাপ্ত মানুষকে কি অন্যায়-অবিচার মানবতা বিরোধী অবমাননাকর আচরণ থেকে মুক্ত বলে বিবেচনা করতে পারি ? মানুষকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাবার জন্য প্রায় সোয়া লক্ষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে। মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষায় তো নয়ই, এমন কোন শিক্ষায় মসজিদ ভাঙ্গা, কেতাব হাদীস পোড়ানো, নিরীহ খোদাভীরু মানুষকে আক্রমণ করতঃ মারা-মারি, খুনা-খুনি রক্তা-রক্তি ইত্যাদি যালেমানা কাজের দৃষ্টান্ত আছে কি ? এসব কাজ কাদের দ্বারা সংঘটিত হয় ? ধার্মিকের দ্বারা না কি দেহের আবরণে সজ্জিত হায়েওয়ানদের দ্বারা ? বিচারের চক্ষে দেখলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, মাটির দেহাবরণে তারা মানুষ হলেও স্বভাবের কারণে কেউ বা বানর, কেউ বা শূকর, কেউ বা কুকুর, কেউ বা ভারবাহী গাধা ইত্যাদি। মানুষ যখন সংসারাসক্তিতে মত্ত হয়ে বিবেক- বিবেচনা শক্তি হারিয়ে মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিয়ে মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন মন্দ কাজ তার কাছে মন্দ বলে বিবেচিত হয় না বরং মন্দ বা অন্যায় কাজকেই গৌরবের বিষয় মনে করতঃ অন্যের নিকট বাহাদুরী প্রকাশ করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাদের সংশোধনের আর কোন উপায় থাকে না, যদি না মহান আল্লাহ্‌তাআলার তরফ থেকে আসমানী সৌভাগ্য তাদের উপর নিপতিত হয়। তাহলেই কেবল তাদের সেই জঘন্যতম স্বভাব পরিহারপূর্বক তারা সত্য ও সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্‌তাআলা অধঃপতিত ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতিকে উদ্ধার করার নিমিত্তে প্রেরিত মহাপুরুষকে আবির্ভূত করেন। যিনি এসে পশুত্বের সর্ব নিম্নস্তর থেকে মানুষকে মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করে তুলেন। ইহাই করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার চিরন্তন বিধান। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে 'বিবেক' নামক কষ্টি পাথর দান করার কারণেই আল্লাহ্‌তাআলার হুযূরে মানুষকে একদিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু চতুষ্পদ জন্তুদের কোন বিচার নেই। যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন জন-সমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে, তার কর্মচারীরা সেই লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সাবধানকারী আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট এসেছিল বটে, কিন্তু আমরা তাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি (সূরা মূলক)। বর্তমানকালে এই অধঃপতিত মানবজাতিকে সত্য ও সঠিক পথ দেখবার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করেছেন। তিনি এসে দিশাহারা বিভ্রান্ত মানব জাতিকে হযরত রসূল করীম-(সঃ)-এর প্রবর্তিত খাঁটি ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দুনিয়া তাঁকে যত শীঘ্র মানবে তত শীঘ্র দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

– সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মোয়াল্লেমদের রিফ্রেশার্স কোর্স এবং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ও দেহাতী মোয়াল্লেমগণের ট্রেনিং ক্লাস অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযল ও করমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের অধীনস্থ মোয়াল্লেমীনের রিফ্রেশার্স কোর্স এবং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ও দেহাতী মোয়াল্লেমগণের ৮দিনব্যাপী ট্রেনিং ক্লাস গত ২রা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে খুবই সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে; আল্হামদুলিল্লাহ্। এতে দেশের বিভিন্ন জামাত থেকে ৩১ জন মোয়াল্লেম, ১৬৮ জন দাঈয়ানে ইলাল্লাহ এবং ২০ জন দেহাতী মোয়াল্লেম অংশ গ্রহণ করেন।

২রা সেপ্টেম্বর সকাল ৯.৩০ মিঃ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ট্রেনিং ক্লাস আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর দোয়া করান এবং ক্লাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে মাওলানা আব্দুল আউয়াল ও সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন।

৯ই সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে জনাব সেক্রেটারী তবলীগ ও ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ আলী নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। সব শেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া করান মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

– আহমদী বার্তা

খুলনা বিভাগীয় কর্মশালায় পুরস্কার বিতরণ করছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্ফে নও

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঘাটুরার ৫ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ঘাটুরা মজলিসে আনসারুল্লাহ্র উদ্যোগে ৫ম বার্ষিক ইজতেমা ১৩ই আগষ্ট '৯৯ইং রোজ শুক্রবার, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরার অস্থায়ী মসজিদ প্রাঙ্গণে জাঁক-জমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ।

মোঃ খলিলুর রহমান লস্কর
সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি

দুইদিন ব্যাপী ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ শুকরিয়া যে, দীর্ঘ ৫ বৎসর পর গত ২০ ও ২১ আগষ্ট '৯৯ইং লাজনা ইমাইল্লাহ্, ক্রোড়ার দুইদিনব্যাপী বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সর্বমোট ৮৯ জন সদস্যার মধ্যে ৪৮ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাজমা আহমদ, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি

ওয়াক্ফে নও মুজাহিদদের সাথে পরিচিত হোন

শেখ খায়রুল বাশার
ওয়াক্ফে নও নং ৪৮১৭-এ
জন্ম ঃ ৫ই এপ্রিল ১৯৮৮
মোছাম্মৎ রহিমা আফসানা
ওয়াক্ফে নং ৪৮১৭-এ
জন্ম ঃ ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৫
পিতা ঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম
দাদা ঃ শেখ সফরুদ্দীন
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, সুন্দরবন

নিয়ামুল হোসেন সৌরভ
ওয়াক্ফে নও নং ১০৯৯০-এ
পিতা ঃ আনোয়ার হোসেন
মামা ঃ শাহ আলম খান,
মোয়াল্লেম
গ্রাম ঃ শালগাঁও
পোঃ বড় কালিসীমা
জেলা ঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ওয়াক্ফে নও ঃ বিভাগীয় কর্মশালা, সুন্দরবন

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL
Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 62 ❑ 5th Issue
September 15, 1999 ❑ Tk. 10.00
Fortnightly
The AHMADI
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

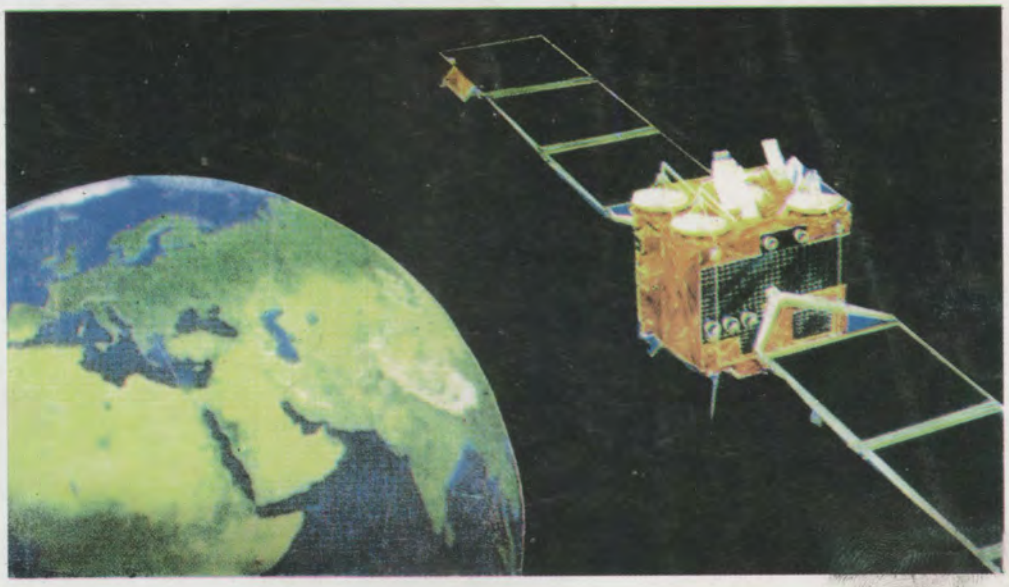

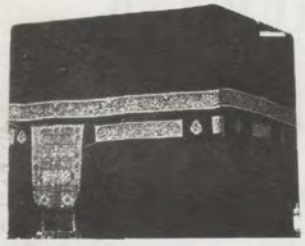

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্‌। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272